ইসলাম শিক্ষা

চতুর্থ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

ইসলাম শিক্ষা

চতুর্থ শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

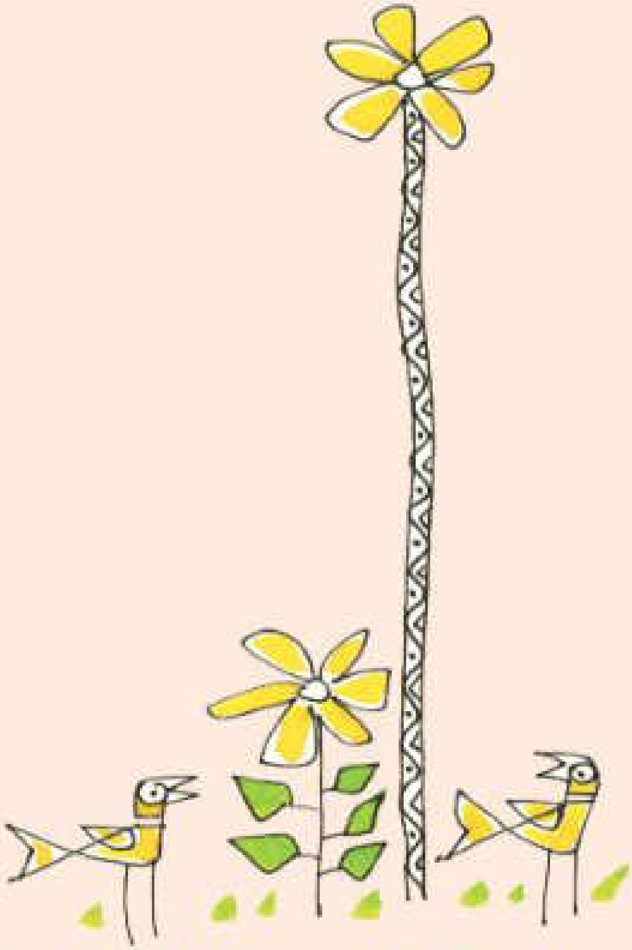

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

রচনা ও সম্পাদনা

অধ্যাপক মুহাম্মদ তমীযুদ্দীন

অধ্যাপক এ. বি. এম. আবদুল মান্নান মিয়া

মুহাম্মাদ কুরবান আলী

শিল্প সম্পাদনা

হাশেম খান

চিত্রাঙ্কন

মোঃ আরিফুল ইসলাম

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট ২০১২

পুনর্মুদ্রণ : জুলাই ২০২৩

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

প্রাথমিক স্তর শিক্ষার ভিত্তিভূমি। প্রাথমিক শিক্ষা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী ও পরিকল্পিত না হলে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই দুর্বল হয়ে পড়ে। এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক স্তরের পরিসর বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তর এবং ধর্ম-বর্ণ কিংবা লৈঙ্গিক পরিচয় কোনো শিশুর শিক্ষাগ্রহণের পথে যেন বাধা না হয়ে দাঁড়ায় এ বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) একটি সমন্বিত শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেছে। এই শিক্ষাক্রমে একদিকে শিক্ষাবিজ্ঞান ও উন্নতবিশ্বের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের চিরায়ত শিখন-শেখানো মূল্যবোধকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে অধিকতর জীবনমুখী ও ফলপ্রসূ করার প্রয়াস বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে। বিশ্বায়নের বাস্তবতায় শিশুদের মনোজাগতিক অবস্থাকেও শিক্ষাক্রমে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান-উপকরণ হলো পাঠ্যপুস্তক। এই কথাটি মাথায় রেখে এনসিটিবি প্রাথমিক স্তরসহ প্রতিটি স্তর ও শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সবসময় সচেষ্ট রয়েছে। প্রতিটি পুস্তক রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিশুমনের বিচিত্র কৌতূহল এবং ধারণক্ষমতা সম্পর্কে রাখা হয়েছে সজাগ দৃষ্টি। শিখন-শেখানো কার্যক্রম যেন একমুখী ও ক্লান্তিকর না হয়ে আনন্দের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে সেদিকটি শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, প্রতিটি বই শিশুদের সুষম মনোদৈহিক বিকাশের সহায়ক হবে। একই সাথে তাদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, অভিযোজন সক্ষমতা, দেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের পথকেও সুগম করবে।

উপর্যুক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে চতুর্থ শ্রেণির জন্য 'ইসলাম শিক্ষা' শীর্ষক এ পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে পরিচিতি প্রদানের মাধ্যমে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ঘটিয়ে ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তনে তাদেরকে সহায়তা প্রদান এ পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের অন্যতম উদ্দেশ্য। সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি অটল বিশ্বাস স্থাপন ও ইসলামের আদর্শ চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, মানবিক ও নৈতিক গুণাবলি অর্জন ও বিকাশে সক্ষম হয় সে বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

বইটি রচনা, সম্পাদনা ও পরিমার্জনে যেসব বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষক নিবিড়ভাবে কাজ করেছেন তাঁদের বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের প্রতিও যাঁরা অলংকরণের মাধ্যমে বইটিকে শিশুদের জন্য চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকটিকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সময় স্বল্পতার কারণে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। সুধিজনের কাছ থেকে যৌক্তিক পরামর্শ ও নির্দেশনা পেলে সেগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেওয়া হবে।

পরিশেষে বইটি যাদের জন্যে, সেই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

ইমান ও আকাইদ	**০১-১৯**
মহান আল্লাহর পরিচয়	০১
আল্লাহ মালিক	০৩
আল্লাহ সর্বশক্তিমান	০৫
আল্লাহ শান্তিদাতা	০৭
কালিমা শাহাদত	০৯
ইমান মুজমাল	১০
ইমান মুফাস্সাল	১১

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবাদত	**২০-৩৮**
তাহারাত, ওযু	২১
গোসল, আযান	২৩
ইকামত	২৬
সালাত	২৯
জুমুআর সালাত	৩৩
ঈদের সালাত	৩৪

তৃতীয় অধ্যায়

আখলাক	**৩৯-৫২**
আব্বা-আম্মাকে সম্মান করা	৪০
শিক্ষককে সম্মান করা	৪১
বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করা	৪২
প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার	৪৩
রোগীর সেবা করা	৪৪
সত্য কথা বলা	৪৫
ওয়াদা পালন করা	৪৬
লোভ না করা	৪৭
অপচয় না করা	৪৮
পরনিন্দা না করা	৪৯

চতুর্থ অধ্যায়

কুরআন মজিদ শিক্ষা	**৫৩-৬৯**
আরবি বর্ণমালা	৫৪
হরকত	৫৬
তানবীন	৫৭
জযম	৫৯
তাশদীদ	৬০
মাদ্দ	৬১
তাজবীদ, মাখরাজ, ইদগাম	৬৩
ইযহার	৬৪
সূরা আন নাসর	৬৬
সূরা আল লাহাব	৬৬
সূরা ইখলাস	৬৭

পঞ্চম অধ্যায়

নবি ও রাসুলগণের পরিচয় ও জীবনাদর্শ	**৭০-৯২**
মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনাদর্শ	৭০
হযরত মূসা (আ)	৭৭
হযরত হুদ (আ)	৮০
হযরত সালিহ (আ)	৮০
হযরত ইসহাক (আ)	৮১
হযরত লূত (আ)	৮২
হযরত শুয়াইব (আ)	৮৪
হযরত ইলিয়াস (আ)	৮৫
হযরত যুলকিফল (আ)	৮৬
হযরত যাকারিয়া (আ)	৮৬
হামদে ইলাহী	৯১
নাতে রাসুল (স)	৯২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

ইমান ও আকাইদ– اَلْاِيْمَانُ وَالْعَقَائِدُ

আমরা মুসলিম। আমাদের ধর্মের নাম ইসলাম। ইসলামের মূল কথাই হলো ইমান। ইমান অর্থ বিশ্বাস। ইসলামের মূল বিষয়গুলোকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করাকে ইমান বলে।

ইসলামের মূল বিষয়গুলোকে অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং সেই অনুসারে আমল করাই হলো প্রকৃত ইমান। যার ইমান আছে তাকে বলে মুমিন।

আকাইদ হলো আকিদা শব্দের বহুবচন। আকিদা অর্থ বিশ্বাস। আর আকাইদ মানে বিশ্বাসমালা। একজন মুসলিমের ইমান ও আকাইদ বিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

মহান আল্লাহর পরিচয় (مَعْرِفَةُ اللّٰهِ)

আমরা মানুষ। আমরা নিজে নিজে সৃষ্টি হইনি। আমাদের সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করছি তাও নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি। এ সুন্দর পৃথিবীও সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তায়ালা। আমাদের জন্য যা যা প্রয়োজন সেসবও তিনিই সৃষ্টি করেছেন।

পৃথিবী

২০২৫

কতো বিশাল এই পৃথিবী। এতে আছে পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, খাল-বিল ও গাছপালা। আছে নানা-রকম ফলফলাদি ও ফুল-ফসল। আরও আছে নানা-রকম পশুপাখি ও জীবজন্তু। এ সবই সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ। তিনি এসব সৃষ্টি করেছেন আমাদের জন্য। তিনিই আলো-বাতাস, পানি ও মাটি সৃষ্টি করে সকল সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখেন, লালন-পালন করেন।

আমরা জাতীয় কবির সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বলব-

এই শস্য-শ্যামল ফসল ভরা মাটির ডালিখানি
খোদা তোমার মেহেরবাণী।

আমাদের মাথার উপর আছে দিগন্তজোড়া বিশাল আকাশ। আকাশে আছে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র। পৃথিবীর চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বড় এক একটি নক্ষত্র। আরও আছে অসংখ্য ছায়াপথ। আর নীহারিকাপুঞ্জ। একসময় এসব কিছুই ছিল না। এসব কে সৃষ্টি করেছেন? এসবও সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ। তিনি এসব শুধু সৃষ্টিই করেননি, অত্যন্ত সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণও করছেন এবং সুন্দরভাবে পরিচালনা করছেন। তিনি সকল সৃষ্টির মালিক। তিনি সর্বশক্তিমান।

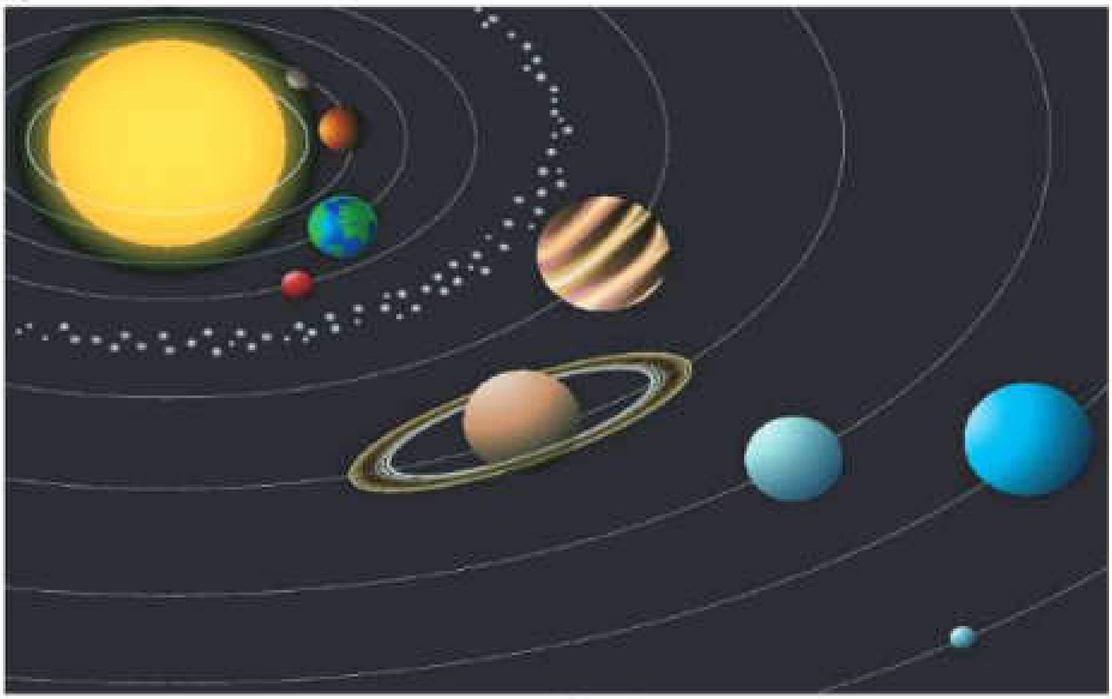

আকাশ ও সৌরজগৎ

মহান আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই। তাঁর সত্তা ও গুণের সাথে তুলনা করা যায় এমন কোনো কিছুই নেই। তিনি অনাদি, অনন্ত।

আমরা জানব ও বিশ্বাস করব–

ক. আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ।

খ. আসমান-জমিন ও এ দুইয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ।

গ. মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং অতুলনীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই।

পরিকল্পিত কাজ: 'আল্লাহ তায়ালার পরিচয়'–শিক্ষার্থীরা সংক্ষেপে নিজ নিজ খাতায় লিখবে।

আল্লাহ মালিক (اَللّٰهُ مَالِكٌ)

আল্লাহু মালিকুন অর্থ আল্লাহ মালিক। মালিক অর্থ অধিপতি। পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের বসবাসের জন্য পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। কতো বড়, কতো সুন্দর এই পৃথিবী। এতে আছে পাহাড়–পর্বত, খাল–বিল, নদী–নালা, পশুপাখি, জীবজন্তু, গাছপালা ও ফুল–ফসল। এসবের মালিক আল্লাহ।

মাটির উপরে যেমন ছোট–বড় অসংখ্য সৃষ্টি আছে, মাটির নিচেও আছে অনেক কিছু। আছে তেল, গ্যাস, কয়লা, লোহা, সোনা, হীরা। আরও কতো কিছু। এসবের মালিকও মহান আল্লাহ।

আল্লাহর সৃষ্ট প্রকৃতির দৃশ্য

আমাদের মাথার উপরে আছে বিশাল আকাশ। আকাশে আছে চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র ও তারা। আরও আছে গ্রহ, উপগ্রহ, ছায়াপথ ও নীহারিকাপুঞ্জ। এ বিশাল পৃথিবীর চেয়েও লক্ষ লক্ষ গুণ বড় এক একটি নক্ষত্র। এসব কিছুরও মালিক আল্লাহ তায়ালা।

কুরআন মজিদে আছে, **"আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব কিছুরই মালিক আল্লাহ।"** আল্লাহ আমাদেরও মালিক। পরম দয়ালু আল্লাহ এসব কিছুই আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় আমাদের জন্ম হয়। তাঁর ইচ্ছায় আমরা বেঁচে থাকি। আবার তাঁর ইচ্ছায়ই আমাদের মৃত্যু হয়। তিনি আমাদের জীবন-মৃত্যুর মালিক। আমাদের ধনসম্পদের মালিক আল্লাহ। আমাদের সুখ-দুঃখের মালিকও তিনি। তাঁর মালিকানায় কোনো শরিক নেই।

সৌরজগৎ

আমরা কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলব:

কুল মাখলুক আল্লাহ তায়ালা
তোমার দয়ার দান
তুমিই সবার স্রষ্টা পালক
সর্বশক্তিমান।
বাদশাকে করো নিমিষে ফকির
ফকিরকে করো ধরার আমির
জীবিতকে তুমি করিতেছো মৃত
মৃতকে দিতেছো প্রাণ ॥

— *সাবির আহমেদ চৌধুরী*

২০২৫

আমরা বিশ্বাস করি, আসমান জমিনের মালিক আল্লাহ। দুনিয়ার সকল ধনসম্পদের মালিক আল্লাহ। আমাদের সুখ-দুঃখের মালিক আল্লাহ। আমাদের জীবন-মৃত্যুর মালিকও আল্লাহ। আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালো কাজ করব।

পরিকল্পিত কাজ : 'আল্লাহ সবকিছুর মালিক'। এ বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীরা ৫টি বাক্য খাতায় লিখবে।

আল্লাহ সর্বশক্তিমান (اَللّٰهُ قَدِيْرٌ)

আল্লাহু কাদীরুন। কাদীর অর্থ সর্বশক্তিমান। তার মতো শক্তি আর কারও নেই। সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষের জন্য এই বিশাল পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর সৃষ্টি করেছেন। গাছপালা, পশুপাখি, জীবজন্তু এসব তিনিই সৃষ্টি করেছেন।

আমাদের মাথার উপর যে বিস্তীর্ণ আকাশ তা সৃষ্টি করেছেন কে? এই আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকাপুঞ্জ, ছায়াপথ এসবই সৃষ্টি করেছেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ। আমরা দেখি প্রতিদিন পূর্বদিক রাঙা করে সূর্য উঠে। দিন হয়, আবার দিন শেষে পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত যায়। রাত হয়। দিন-রাতের এ পরিবর্তন কে করেন? সর্বশক্তিমান আল্লাহই এ পরিবর্তন করেন। তিনি অসীম শক্তির অধিকারী। তাঁর হুকুমে পৃথিবীর সবকিছু চলে। মহাকাশের সবকিছুই তাঁর হুকুমে চলে।

প্রাকৃতিক শোভামণ্ডিত জনপদের দৃশ্য

তার ব্যবস্থাপনায় চন্দ্র–সূর্য, গ্রহ–নক্ষত্র ও নীহারিকাপুঞ্জ আপন কক্ষপথে পরিচালিত হয়। কোথাও কোনো অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা বা সংঘর্ষ দেখা যায় না। মহান আল্লাহ আলো, বাতাস, আগুন, পানি সৃষ্টি করেছেন। তিনিই এসব নিয়ন্ত্রণ করেন। মেঘমালা পরিচালনা করেন। বৃষ্টিবর্ষণ করে শুকনা মাটিতে প্রাণের সঞ্চার করেন। তাঁর ইচ্ছাতেই মরুভূমির বুক চিরে সুপেয় পানির ঝরনাধারা বেরিয়ে আসে। আমরা মাটিতে বীজ বপন করি, তা হতে চারা গজায়।

আলো, বাতাস, পানি অনেক সময় আমাদের বিপদের কারণ হয়। অতিবৃষ্টি, জলোচ্ছ্বাসে ঘরবাড়ি, গাছপালা ডুবে যায়। মানুষ ও পশুপাখি ভেসে যায়। ভূমিকম্প ও ঝড়-তুফানে ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। বড় বড় গাছপালা উপড়ে যায়। সাজানো গোছানো জনপদ লন্ডভন্ড হয়ে যায়। আমাদের আশ্রয়টুকুও থাকে না। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া 'সিডর' ও 'আইলা'র তান্ডবের কথা আমরা আজও ভুলতে পারিনি। এ ধরনের দুর্যোগে আমরা আল্লাহর উপর ভরসা রাখব। দুর্গতদের সাহায্যে এগিয়ে আসব। আলো-বাতাস, আগুন–পানি সবকিছুই মহান আল্লাহর শক্তির অধীন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে লন্ডভণ্ড জনপদের দৃশ্যাবলি

আল্লাহ শাস্তি দিতে চাইলে কেউ তাকে রক্ষা করতে পারে না। তিনি নমরুদ, ফিরআউনের মতো পরাক্রমশালী জালিম শাসকদের ধ্বংস করেছেন। হযরত নূহ (আ)-এর অবাধ্য সম্প্রদায়কে প্লাবনে ডুবিয়ে মেরেছেন। ছোট ছোট পাখি দ্বারা আবরাহা বাদশাহর বিশাল বাহিনীকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা রক্ষা করলে কেউ তাকে মারতে পারে না। অত্যাচারী নমরুদ হযরত ইবরাহীম (আ)কে পুড়িয়ে মারার জন্য অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। কিন্তু আগুন তাঁকে স্পর্শও করতে পারেনি। কারণ আগুন সর্বশক্তিমান আল্লাহর অধীন। মহান আল্লাহ ফিরআউনের হাত থেকে হযরত মূসা (আ)-কে রক্ষা করেছিলেন। ঈসা (আ)-কে ঘাতকদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স)-কেও কাফিরদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

আমরা মহান আল্লাহকে সর্বশক্তিমান হিসাবে বিশ্বাস করব। তাঁর কাছেই সাহায্য চাইব। কেবলমাত্র তাঁরই উপর ভরসা রাখব।

আল্লাহ শান্তিদাতা (اَللّٰهُ سَلَامٌ)

আল্লাহু সালামুন। সালাম অর্থ শান্তি। আল্লাহু সালামুন অর্থ আল্লাহ শান্তিদাতা। আমাদের মন যখন ভালো থাকে, তখন শান্তি লাগে। শরীর ভালো থাকলে মনে শান্তি থাকে।

যখন আমাদের মন খারাপ হয় তখন শান্তি লাগে না। শরীর খারাপ হলেও মনে শান্তি থাকে না। সবাই আমাদের জন্য দোয়া করেন। আল্লাহ আমাদের রোগমুক্ত করেন। আমরা সুস্থ হই। শান্তি পাই।

আমাদের পরিবারে আছেন আব্বা-আম্মা, ভাইবোন। আছেন দাদা-দাদি। পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে আমরা অস্থির হয়ে পড়ি। আমাদের শান্তি থাকে না। আমরা তাঁদের সেবা করি। আল্লাহর কাছে দোয়া করি। তিনি আমাদের বিপদমুক্ত করেন। আমরা শান্তি পাই।

অনেক সময় আমাদের বইখাতা, কলম-পেন্সিল হারিয়ে যায় তখন আমাদের মন খারাপ হয়ে যায়। শান্তি থাকে না। আবার যখন তা খুঁজে পাই, তখন শান্তি পাই। আমরা যখন বন্ধু ও সহপাঠীদের সাথে মিলেমিশে থাকি, তখন ভালো লাগে। বন্ধু ও সহপাঠীদের সাথে কখনো কখনো ঝগড়া হয়। মন খারাপ হয়। তখন শান্তি লাগে না। আমরা তাড়াতাড়ি ঝগড়া মিটিয়ে ফেলব, তা হলে শান্তি লাগবে।

রাসুল (স) বলেছেন, 'সেই ব্যক্তিই সত্যিকার মুসলমান যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।' রাসুল (স) সবসময় শান্তির জন্য কাজ করতেন। শান্তির জন্য অমুসলিমদের সাথেও সন্ধি করেছেন। একে অপরের সাথে দেখা হলে আমরা সালাম দেই। শান্তি কামনা করি। বলি **'আসসালামু আলাইকুম'**। **অর্থ:** আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। সালামের জবাবে বলি **'ওয়া আলাইকুমুস সালাম'**। **অর্থ:** আপনার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক।

সালাম বিনিময় একটি সুন্দর নিয়ম। এতে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

কুশল বিনিময়

প্রচুর ধনসম্পদ থাকলেই শান্তি পাওয়া যায় না। অনেক আগে কারুন নামে এক ব্যক্তি ছিল। তার ধনসম্পদ ছিল প্রচুর। কিন্তু তৃপ্তি ছিল না, শান্তি ছিল না। সে আরও সম্পদ লাভের জন্য অস্থির ছিল। সে আল্লাহর শোকর করত না। গরিবের হক আদায় করত না। যাকাত দিত না। আল্লাহর হুকুমে সে তার ধনসম্পদসহ ধ্বংস হয়ে গেল।

আল্লাহ তায়ালা যাকে শান্তি দেন সেই শান্তি পায়। কুঁড়েঘরে থাকলেও শান্তি পায়। অভাব-অনটনেও শান্তিতে থাকে। আল্লাহ শান্তি দিলে কেউ তার ক্ষতি করতে পারে না।

অত্যাচারী শাসক নমরুদ নিজেকে উপাস্য দাবি করেছিল। হযরত ইবরাহীম (আ) তা মানতে পারলেন না। শাস্তি দেওয়ার জন্য নমরুদ তাঁকে জ্বলন্ত আগুনের কুণ্ডে নিক্ষেপ করল। আল্লাহ তায়ালা আগুনকে বললেন, "হে আগুন! ইবরাহীমের জন্য ঠান্ডা হও, শান্তিদায়ক হও।" আগুন হযরত ইবরাহীম(আ)-কে স্পর্শও করতে পারল না।

একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই শান্তিদাতা। যারা আল্লাহর হুকুম মেনে চলে তিনি তাদের শান্তি দেন। দুনিয়াতে শান্তি দেন। আখিরাতেও শান্তি দিবেন। তাঁর একটি গুণবাচক নাম 'সালাম'। সালাম অর্থ শান্তিদাতা।

আমরা আল্লাহ তায়ালাকে পরম শান্তিদাতা বলে বিশ্বাস করব। তাঁর কাছেই শান্তি চাইব। সবার সাথে শান্তিতে বাস করব। শান্তির পক্ষে কাজ করব।

কালিমা শাহাদাত (كَلِمَةُ شَهَادَةٍ)

কালিমাতু শাহাদাতিন। কালিমা অর্থ বাক্য। শাহাদাত অর্থ সাক্ষ্য দেওয়া। কালিমা শাহাদাত মানে সাক্ষ্য দেওয়ার বাক্য। এই কালিমা দ্বারা তাওহিদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেই। এ দ্বারা আমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই মাবুদ হিসেবে স্বীকার করে নেই। হযরত মুহাম্মদ (স)-কে আল্লাহর বান্দা ও রাসুল হিসেবে সাক্ষ্য দেই। তাওহিদ ও রিসালাতের উপর ইমান আনি। এটি ইসলামের মূল বিষয়। কালিমা শাহাদাত হলো:

আশ্‌হাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু	اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
ওয়াহ্‌দাহূ লা শারীকালাহূ ওয়া আশহাদু	وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ
আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহূ	اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

কালিমা শাহাদাতে দুটি অংশ আছে :

প্রথম অংশ: আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহূ লা শারীকালাহূ

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক, তার কোনো শরিক নেই।

এই প্রথম অংশ দ্বারা আমরা আমাদের স্রষ্টা, পালনকারী, রিজিকদাতা, পরম দয়ালু, একমাত্র আল্লাহকে মাবুদ হিসেবে স্বীকার করে নেই। আর সাক্ষ্য দেই– আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়।

ওয়াহ্‌দাহূ দ্বারা আমরা আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের স্বীকারোক্তি করি। আর 'লা শারীকালাহূ' দ্বারা শিরককে বাতিল বলে ঘোষণা করি।

কারণ শিরক হলো তাওহিদের বিপরীত। একজন মুমিন কোনো রকম শিরকে লিপ্ত হতে পারে না। আমরা জানি আল্লাহর কোনো শরিক নেই।

দ্বিতীয় অংশ : ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসুলুহূ

অর্থ : "আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (স) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।"

এই দ্বিতীয় অংশ দ্বারা সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মদ (স) যেমন আল্লাহর বান্দা তেমনি তিনি আল্লাহর রাসুল।

আমরা আল্লাহকে চিনতাম না। আল্লাহ সম্বন্ধে জানতাম না। কোন কাজে আল্লাহ তায়ালা খুশি হন তাও জানতাম না। মুহাম্মদ (স) আমাদের আল্লাহর পরিচয় জানিয়েছেন। তাঁর বাণী শুনিয়েছেন। আল্লাহর ইবাদাত করার নিয়ম শিখিয়েছেন। তিনি নিজে আল্লাহর বিধান পালন করে আমাদের তা হাতে–কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা আল্লাহর পথে চলব। রাসুল (স)–এর দেখানো পথে চলব। তাওহিদ ও রিসালাতে বিশ্বাস হলো ইমানের মূলকথা।

জাতীয় কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলব :

তুমি কতই দিলে রতন, ভাই বেরাদার পুত্র স্বজন
ক্ষুধা পেলে অন্ন জোগাও, মানি চাই না মানি
খোদা তোমার মেহেরবানি ॥
খোদা তোমার হুকুম তরক করি আমি প্রতি পায়
তবু আলো দিয়ে বাতাস দিয়ে বাঁচাও এ বান্দায় ॥
শ্রেষ্ঠ নবী দিলে মোরে, তরিয়ে নিতে রোজ হাশরে
পথ না ভুলি তাইতো দিলে পাক কুরআনের বাণী
খোদা তোমার মেহেরবানি ॥

ইমান মুজমাল (إِيْمَانٌ مُجْمَلٌ)

আমান্‌তু বিল্লাহি কামা হুয়া বিআস্‌মাইহি	اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهٖ
ওয়া সিফাতিহী ওয়া ক্বাবিলতু জামী'আ	وَ صِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ
আহ্‌কামিহী ওয়া আরকানিহী	اَحْكَامِهٖ وَاَرْكَانِهٖ

অর্থ : আমি ইমান আনলাম আল্লাহর উপর ঠিক তেমনি যেমন আছেন তিনি, তার সব নাম ও গুণাবলিসহ। আর মেনে নিলাম তার সব হুকুম–আহকাম ও বিধি–বিধান।

ইমান অর্থ বিশ্বাস। আর মুজমাল অর্থ সংক্ষিপ্ত । ইমান মুজমাল মানে সংক্ষিপ্ত বিশ্বাস। ইসলামের মূল বিষয়গুলোকে সংক্ষেপে বিশ্বাস ও স্বীকার করাকে বলে ইমান মুজমাল। ইমান মুজমাল দ্বারা সংক্ষিপ্ত কথায় ইমানের ঘোষণা দেওয়া হয়।

আমাদের মাবুদ মহান আল্লাহ। তিনি এক, অদ্বিতীয়, অতুলনীয়। তার কোনো শরিক নেই। তার আছে অনেক সুন্দর গুণবাচক নাম। আল্লাহর সত্তায় যেমন বিশ্বাস করতে হয় তেমনি তার সিফাত বা গুণাবলিতেও বিশ্বাস করতে হয়। তার সত্তার সাথে কারও তুলনা হয় না। তেমনি তার গুণের সাথে তুলনা করা যায় এমন কোনো কিছুই নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তার মতো কোনো কিছুই নেই।"

একজন মুমিন মুসলিমকে আল্লাহ তায়ালার একক সত্তায় বিশ্বাস করতে হয়। তার গুণাবলিতে বিশ্বাস করতে হয়। তারপর আল্লাহর আহকাম ও আরকান বা বিধিবিধান গ্রহণ করতে হয়। তার আদেশ–নিষেধ মেনে চলতে হয়। আমাদের জন্য যা কল্যাণকর, যা ভালো তিনি তা গ্রহণ করতে বলেছেন। আর যা অকল্যাণকর, যা মন্দ তা বর্জন করতে বলেছেন। এই গ্রহণ ও বর্জন মিলেই হলো ইমান। ইমান মুজমাল খুব সংক্ষিপ্ত। কিন্তু এর বিষয়বস্তু ব্যাপক। এর তাৎপর্য গভীর।

আমরা আল্লাহ তায়ালার সত্তায় ও গুণাবলিতে বিশ্বাস করব। মহান আল্লাহর বিধিবিধান ও আদেশ–নিষেধ মেনে নেব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা ইমানে মুজমালের অর্থ সুন্দর করে খাতায় লিখবে।

ইমান মুফাস্সাল (اِيْمَانٌ مُفَصَّلٌ)

আমান্তু বিল্লাহি ওয়ামালাইকাতিহী ওয়াকুতুবিহী	اٰمَنْتُ بِاللهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ
ওয়ারুসুলিহী ওয়াইয়াওমিল আখিরি ওয়ালকাদরি	وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ
খাইরিহী ওয়াশাররিহী মিনাল্লাহি তাআলা	خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللهِ تَعَالٰى
ওয়াল বা'সি বা'দাল মাউত।	وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

অর্থ : আমি ইমান আনলাম আল্লাহ, তার ফেরেশতা, তার কিতাব ও তার রাসুলগণের উপর। আরও ইমান আনলাম শেষ দিবসে ও তাকদিরের ভালোমন্দ যা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে।

ইমান অর্থ বিশ্বাস। আর মুফাসসাল অর্থ বিস্তারিত। ইমান মুফাসসাল অর্থ বিস্তারিত বিশ্বাস। আমরা মুমিন। ইসলামের কতকগুলো মূল বিষয়ের উপর আমাদের ইমান আনতে হয়। আমরা এর আগে যে বিষয়গুলোকে সংক্ষিপ্ত কথায় স্বীকার করেছি, এখন সে বিষয়গুলোকে বিস্তারিত ভাবে জানব। বিস্তারিতভাবে স্বীকার করব। সে জন্য একে বলা হয় ইমান মুফাসসাল।

ইমান মুফাস্‌সালে আমরা সাতটি বিষয়ের উপর ইমান আনি। বিষয়গুলো হলো :

১. আল্লাহ	২. ফেরেশতা	৩. কিতাব
৪. রাসুলগণ	৫. শেষ দিবস	৬. তাকদির
৭. মৃত্যুর পর পুনরুত্থান		

১। ইমানের প্রথম বিষয় : আল্লাহ তায়ালার উপর বিশ্বাস

ইমানের প্রথম কথাই হলো আল্লাহ তায়ালার উপর বিশ্বাস। আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ তার সত্তায় এক ও অদ্বিতীয়। তার কোনো শরিক নেই। তিনি তার গুণাবলিতেও অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। তিনি অনাদি, অনন্ত। তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। যখন কোনো কিছুই ছিল না তখন ছিলেন তিনি। আবার একদিন সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে তখন তিনিই থাকবেন। মহান আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছু শোনেন ও দেখেন। আসমান জমিনের সবকিছু তার সৃষ্টি। তিনি সকল সৃষ্টির পালনকর্তা। তিনি পরম দয়ালু। তিনিই সবকিছুর মালিক। আমরা ভালো কাজ করলে তিনি খুশি হন। মন্দ কাজ করলে তিনি অসন্তুষ্ট হন। আমরা আল্লাহর উপর ভরসা রেখে ভালো কাজ করব।

২। ইমানের দ্বিতীয় বিষয় : মালাইকা বা ফেরেশতাগণে বিশ্বাস

ফেরেশতাগণ আল্লাহ তায়ালার বিশেষ সৃষ্টি। তাঁরা নূরের তৈরি। নূর মানে আলো। তাঁরা আল্লাহর আদেশে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত। তাঁরা কখনো আল্লাহর হুকুম অমান্য করেন না। তাঁদের পানাহারের প্রয়োজন নেই। আল্লাহর জিকিরই তাঁদের একমাত্র কাজ তাঁদের সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। তাঁদের মধ্যে চারজন ফেরেশতা প্রসিদ্ধ।

ক. হযরত জিবরাইল (আ) : তিনি নবি-রাসুলগণের কাছে আল্লাহর ওহি নিয়ে আসতেন। ওহি মানে আল্লাহর বাণী।

খ. হযরত মিকাইল (আ) : তিনি জীবের জীবিকা বণ্টন ও মেঘবৃষ্টির দায়িত্বে নিয়োজিত।

গ. হযরত আযরাইল (আ) : তিনি আল্লাহর হুকুমে জীবের জান কবজ করেন।

ঘ. হযরত ইসরাফিল (আ) : তিনি শিঙ্গা হাতে আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় আছেন। তিনি প্রথম ফুঁ দেবেন, তাতে সকল সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। দ্বিতীয় ফুঁ দেবেন তখন সবকিছু জীবন ফিরে পাবে।

একদল ফেরেশতা আছেন, যাঁরা মানুষের ভালো-মন্দ কাজের হিসাব রাখেন। তাঁদের বলে কিরামান কাতিবিন। মানে সম্মানিত লেখকগণ। মুনকার-নাকির নামে আরও ফেরেশতা আছেন। তারা কবরে প্রশ্ন করবেন। প্রশ্ন করবেন- আল্লাহ, রাসুল ও দীন সম্বন্ধে। আল্লাহর অনুগত বান্দারা এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে।

৩। ইমানের তৃতীয় বিষয় : আসমানি কিতাবে বিশ্বাস

আল্লাহ তায়ালা নবি-রাসুলের কাছে ওহি পাঠিয়েছেন। ওহি হলো আল্লাহর বাণী। আল্লাহর বাণীসমূহের সমষ্টিকে বলে আসমানি কিতাব। আসমানি কিতাবে আছে মানুষের জন্য হিদায়াত বা মুক্তির কথা।

আসমানি কিতাব হলো ১০৪ খানা। ৪ খানা বড়। আর ১০০ খানা ছোট। ছোট কিতাবকে সহীফা বলে। সহীফা মানে পুস্তিকা।

৪ খানা বড় কিতাব হলো :

১. তাওরাত : হযরত মূসা (আ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল।

২. যাবুর : হযরত দাউদ (আ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল।

৩. ইনজিল : হযরত ঈসা (আ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল।

৪. কুরআন মজিদ : হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল।

কুরআন মজিদ সর্বশেষ আসমানি কিতাব। এতে আছে কিয়ামাত পর্যন্ত বিশ্বের সকল মানুষের সব সমস্যার সমাধান, ভালো হওয়ার শিক্ষা। আমরা সকল কিতাবে বিশ্বাস করব। আর কুরআন মজিদের শিক্ষা মেনে চলব।

৪। ইমানের চতুর্থ বিষয় : নবি–রাসুলে বিশ্বাস

আমরা আগেই জেনেছি, মানুষের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালা ওহি পাঠিয়েছেন। ওহি আসত নবি–রাসুলগণের কাছে। নবি–রাসুলগণ মানুষের শিক্ষক। তাঁরা আদর্শ শিক্ষক। তাঁরা ছিলেন নিঃস্বার্থ মানবদরদি। তাঁরা মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতেন। তাকে খুশি করার পথ দেখাতেন। কিতাবে বিশ্বাস করা যেমন ইমানের অঙ্গ, নবি–রাসুলে বিশ্বাস করাও তেমনি ইমানের অঙ্গ।

প্রথম নবি হলেন হযরত আদম (আ)। আর শেষ নবি হলেন হযরত মুহাম্মদ (স)। এই দুজনের মাঝে আরো অনেক নবি–রাসুল এসেছেন। আল্লাহ বলেন, "এমন কোনো জনপদ নেই যেখানে আমি কোনো নবি পাঠাইনি।"

কুরআন মজিদে ২৫ জন নবি–রাসুলের নাম উল্লেখ আছে। যেমন হযরত আদম (আ), হযরত ইদরীস (আ), হযরত নূহ (আ), হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত ইসমাঈল (আ), হযরত ইসহাক (আ), হযরত ইয়াকুব (আ), হযরত ইউসুফ (আ), হযরত হূদ (আ), হযরত সালিহ (আ), হযরত লূত (আ), হযরত শুআইব (আ), হযরত আইয়ুব (আ), হযরত জাকারিয়া (আ), হযরত দাউদ (আ), হযরত সুলাইমান (আ), হযরত মূসা (আ), হযরত ঈসা (আ), হযরত মুহাম্মদ (স)। আমরা সকল নবি–রাসুলে বিশ্বাস করব। তাঁদের সম্মান করব। আর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি হযরত মুহাম্মদ (স)–এর আদর্শ মেনে চলব।

৫। ইমানের পঞ্চম বিষয় : শেষ দিবসে বিশ্বাস

আমরা এই দুনিয়ায় চিরদিন বেঁচে থাকি না। এ জীবন চিরস্থায়ী নয়, ক্ষণস্থায়ী। আমাদের যেমন জন্ম আছে, তেমনি মৃত্যুও আছে। সকল প্রাণীরই মৃত্যু আছে। যার জীবন আছে তার মৃত্যু আছে। আমাদের সুন্দর পৃথিবীও একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

আমাদের মৃত্যুর পরের জীবনকে বলে আখিরাত। আখিরাত মানে পরকাল। মৃত্যুর পরেই এ জীবনের শুরু হয়। কবর, কিয়ামাত, হাশর, জান্নাত, জাহান্নাম-এসবই আখিরাতের জীবনের অন্তর্ভুক্ত। আখিরাতের জীবনের শুরু আছে শেষ নেই। সে জীবন অনন্তকালের। আল্লাহ বলেন, "এ দুনিয়ার জীবনতো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু। আর আখিরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস।"

ইমানের অন্যান্য বিষয়ের উপর বিশ্বাস করা যেমন জরুরি, আখিরাত বা শেষ দিবসে বিশ্বাস করাও তেমনি জরুরি। দুনিয়ায় যে যেমন কাজ করবে আখিরাতে তেমনি ফল ভোগ করবে। ভালো কাজ করলে আখিরাতে পুরস্কার পাবে। আর মন্দ কাজের জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে। শেষ দিবস বা আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তি তার কাজকর্মে সতর্ক থাকে। পুরস্কারের আশায় ভালো কাজ করে। আর শাস্তির ভয়ে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে। এতে তার নৈতিক চরিত্র উন্নত হয়।

কবি যথার্থই বলেছেন,

দুনিয়াটা আখিরাতের
খামার বাড়ি ভাই
ভবের হাটের ক্ষেতখামারে
ফসল ফলান চাই ॥
এই ফসলের নেইকো জুড়ি
এক কণা তার হয় না চুরি
হিসাব লেখেন দুই মুহুরি
সদা সর্বদাই ॥
অচিন দেশের যাত্রী সবাই
টারমিনালে ক্ষণিকের ঠাঁই
কখন যে হায় ঘণ্টা বাজে
ঘড়ির সময় হলে ॥

— সাবির আহমেদ চৌধুরী

৬। ইমানের ষষ্ঠ বিষয় : তাকদিরে বিশ্বাস

তাকদির মানে ভাগ্য। আমাদের ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণকারী আল্লাহ তায়ালা। আমাদের জীবনে যা ঘটে, যা হয়, সবই হয় আল্লাহর নির্ধারিত হুকুমে। এই নির্ধারিত হুকুমকে বলে তাকদির। আমাদের ভাগ্যে কী আছে, আমরা তা জানি না। আমরা চেষ্টা করব, কাজ করে যাব। আর ফলাফলের জন্য আল্লাহর উপর নির্ভর করব। সফল হলে শোকর করব। বিফল হলে সবুর করব, তাকদির বলে মেনে নিব। তাকদিরে বিশ্বাস মানুষকে অলস করে না।

আশায় উজ্জীবিত করে।

৭। ইমানের সপ্তম বিষয় : মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস

মৃত্যুই আমাদের শেষ কথা নয়। ইহকালে আমরা যেসব কাজ করি তার জবাবদিহি করতে হবে পরকালে। সকলকে আবার জীবিত করে হাশরের ময়দানে উঠানো হবে। সেখানে হিসাব–নিকাশ ও সাক্ষ্যপ্রমাণ নিয়ে বিচার করা হবে। বিচারক হবেন মহান আল্লাহ। ভালো কাজের পুরস্কার হিসেবে জান্নাত দেওয়া হবে। জান্নাত হলো পরম সুখের স্থান। যারা পাপ করবে, খারাপ কাজ করবে, তাদের শাস্তির জন্য নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে। জাহান্নাম হলো চরম দুঃখ–কষ্ট ও শাস্তির স্থান।

পুনরুত্থানে বিশ্বাস মানুষকে দায়িত্বশীল করে তোলে। পুরস্কারের আশায় সৎকর্মশীল করে তোলে। আর শাস্তির ভয়ে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। এতে নৈতিক চরিত্র উন্নত হয়। আমরা–

একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই মাবুদ বলে বিশ্বাস করব।

আল্লাহর ফেরেশতাগণে বিশ্বাস করব।

আল্লাহর রাসুলগণকে বিশ্বাস করব।

শেষ দিবসে বিশ্বাস করব।

তাকদিরে বিশ্বাস করব।

মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করব।

আখিরাতের পুরস্কারের আশায় ভালো কাজ করব।

আখিরাতের শাস্তির ভয়ে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকব।

আমাদের নৈতিক চরিত্র উন্নত করব।

পরিকল্পিত কাজ:

১. শিক্ষার্থীরা ইমান মুফাস্‌সালের অর্থ সুন্দর করে খাতায় লিখবে।

২. শিক্ষার্থীরা চারজন প্রধান ফেরেশতার নাম ও তাঁদের কাজ খাতায় লিখবে।

৩. শিক্ষার্থীরা দশজন নবি–রাসুলের নাম খাতায় লিখবে।

অনুশীলনী

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

ক.বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

১। ইমান অর্থ কী?

ক. সত্য কথা বলা খ. বিশ্বাস
গ. গচ্ছিত রাখা ঘ. শৃঙ্খলা

২। আমাদের স্রষ্টা কে?

ক. মাতা খ. পিতা
গ. আল্লাহ ঘ. পিতামাতা উভয়ই

৩। আমাদের জীবন-মৃত্যুর মালিক কে?

ক. আল্লাহ খ. আযরাইল (আ)
গ. নবিগণ ঘ. রাসুলগণ

৪। 'সালাম' শব্দের অর্থ কী?

ক. দয়া খ. শান্তি
গ. সৃষ্টি ঘ. ক্ষমা

৫। ওহি নিয়ে আসতেন কোন ফেরেশতা?

ক. আযরাইল (আ) খ. মিকাইল (আ)
গ. ইসরাফিল (আ) ঘ. জিবরাইল (আ)

৬। আসমানি কিতাব কতো খানা?

ক. ৪ খানা খ. ১০০ খানা
গ. ১০৪ খানা ঘ. ১১০ খানা

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১) যার ইমান আছে তাকে বলে ——— ।

২) আল্লাহু সালামুন অর্থ আল্লাহ ———।

৩) পরস্পরে দেখা হলে আমরা ——— দেই।

৪) মুহাম্মদ (স) আল্লাহর ——— ও রাসুল।

৫) তাকদির মানে ——— ।

গ. রেখা টেনে অর্থ মিলাও :

১) মালিক	বাক্য
২) কাদীর	শান্তি
৩) সালাম	অধিপতি
৪) কালিমা	সর্বশক্তিমান

ঘ. রেখা টেনে সঠিক উত্তর মিলাও :

১) আযরাইল (আ)	ওহি আনতেন
২) জিবরাইল (আ)	মেঘবৃষ্টি ও রিজিকের দায়িত্বে
৩) ইসরাফিল (আ)	জীবের জান কবজ করেন
৪) মিকাইল (আ)	শিঙ্গায় ফুঁ দেবেন

সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১) আল্লাহ তায়ালার পাঁচটি গুণবাচক নাম লেখ।

২) চারজন প্রসিদ্ধ ফেরেশতার নাম লেখ।

৩) চারখানা বড় কিতাবের নাম লেখ।

৪) আসমানি কিতাব কয়টি?

৫) সর্বশেষ নবি কে?

৬) সর্বশেষ আসমানি কিতাব কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১) সংক্ষেপে আল্লাহর পরিচয় দাও।

২) 'আল্লাহ সর্বশক্তিমান' কথাটির অর্থ বুঝিয়ে লেখ।

৩) 'আল্লাহ শান্তিদাতা' বাক্যটি বুঝিয়ে লেখ।

৪) প্রসিদ্ধ ফেরেশতাদের নাম ও তাঁদের কাজ বর্ণনা কর।

৫) আসমানি কিতাব কাকে বলে? সংক্ষেপে সর্বশেষ আসমানি কিতাবের বর্ণনা দাও।

পরিকল্পিত কাজ

ক. এই শব্দগুলো খাতায় লেখ।

يَااَللّٰهُ	يَامَالِكُ
يَاسَلَامُ	يَاقَدِيْرُ

খ. প্রকৃতির একটি ছবি আঁকো।

ইবাদত (عِبَادَةٌ)

ইবাদত অর্থ গোলামি করা, মালিকের কথামতো চলা। আল্লাহ্ তায়ালা ও তার রাসুল (স)–এর কথামতো কাজ করাকে ইবাদত বলে। ইবাদত শব্দটির অর্থ ব্যাপক। যেমন, সালাত আদায় করা, কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করা, রোগীর সেবা করা, সত্য কথা বলা সবকিছুই ইবাদত।

ইবাদতের পরিচয়

আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন মজিদে বলেন, "আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এজন্য যে, তারা শুধু আমারই ইবাদত করবে।"

এর অর্থ হলো :

১. আমরা কেবল আল্লাহ্ তায়ালার গোলামি করব, অন্য কারও নয়।

২. আমরা কেবল আল্লাহ্ তায়ালার আদেশমতো চলব, অন্য কারও নয়।

৩. কেবলমাত্র তারই সামনে মাথা নত করব, অন্য কারও নয়।

৪. কেবলমাত্র তাকেই ভয় করব, অন্য কাউকে নয়।

৫. কেবলমাত্র তার কাছে সাহায্য চাইব, অন্য কারও কাছে নয়।

এই পাঁচটি জিনিসকে আল্লাহ তায়ালা বুঝিয়েছেন ইবাদত শব্দ দ্বারা। কুরআন মজিদের বিভিন্ন আয়াত হতে ইবাদত শব্দের এরূপ অর্থ পাওয়া যায়। তাই অর্থ বুঝে ইবাদত করা উচিত। আমাদের প্রিয় নবি (স) এবং তাঁর পূর্ববর্তী সকল নবির শিক্ষার সারকথা হলো, 'আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত করো না।' আমরা সালাতের প্রতি রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়ি; তখন একথাগুলোরই ঘোষণা করে থাকি।

ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

অর্থ : আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি। আমরা শুধু তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর বিভিন্ন ইবাদত ফরজ করেছেন। যেমন সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ।

দলীয় কাজ : দলে বসে পরস্পর আলাপ-আলোচনা করে ইবাদতের একটি তালিকা তৈরি করে মার্কার দিয়ে পোস্টার পেপারে লিখবে।

তাহারাত - (طَهَارَةٌ)

আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যারা পাক-পবিত্র থাকে আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।"

মহানবি (স) বলেন, "পবিত্রতা ইমানের অঙ্গ।"

পাক-পবিত্র থাকাকেই তাহারাত বলে। তাহারাত অর্থ পবিত্রতা। ওযু ও গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা যায়। যারা পাকসাফ থাকে, পরিষ্কার পোশাক পরে, তাদেরকে সবাই ভালোবাসে। সবাই তাদের আদর করে। পাকসাফ থাকলে দেহমন ভালো থাকে। লেখাপড়ায় মন বসে। আল্লাহ খুশি হন।

ওযু - (وُضُوْءٌ)

কুরআন মজিদে আল্লাহ তায়ালা সালাত আদায়ের আগে ওযু করার নির্দেশ দিয়েছেন। পাকসাফ ও পবিত্র থাকার অনেক নিয়ম আছে। ওযু তার মধ্যে একটি উত্তম নিয়ম। সালাতের আগে ওযু করা ফরজ। ওযু ছাড়া সালাত আদায় হয় না।

ওযুর ফরজ

ওযুর ফরজ চারটি। যথা :

১. মুখমণ্ডল ধোয়া।
২. কনুইসহ উভয় হাত ধোয়া।
৩. চার ভাগের এক ভাগ মাথা মাসাহ করা।
৪. গিরাসহ উভয় পা ধোয়া।

পরিকল্পিত কাজ : ওযুর ফরজগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

ওযুর সুন্নত

ওযুর সুন্নত ১১টি। যথা:

১. নিয়ত করা,
২. বিসমিল্লাহ বলে ওযু আরম্ভ করা,
৩. দাঁত মাজা,
৪. কজি পর্যন্ত দুই হাত তিনবার ধোয়া,
৫. তিনবার কুলি করা,
৬. পানি দিয়ে তিনবার নাক সাফ করা,
৭. প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার ধোয়া,
৮. কান মাসাহ করা,
৯. হাত-পা ধোয়ার সময় ডান হাত ও ডান পা আগে ধোয়া,
১০. সম্পূর্ণ মাথা একবার মাসাহ করা,
১১. ওযুর কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে পর পর করা।

আব্বা-আম্মা, বড় ভাইবোন, শিক্ষক ও মসজিদের ইমাম সাহেব ভালোভাবে ওযু করেন। আমরা তাঁদের ওযু দেখে ভালোভাবে ওযু করা শিখব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষক প্রথমে ওযু করে শিক্ষার্থীদের দেখাবেন। এরপর শিক্ষার্থীরা ওযু করবে। শিক্ষক দেখবেন। প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দেবেন।

ওযু নষ্ট হওয়ার কারণ

নানা কারণে ওযু নষ্ট হয়। এগুলোর প্রতি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। যেসব কারণে ওযু নষ্ট হয় তা হলো :

১. পেশাব বা পায়খানার রাস্তা দিয়ে কিছু বের হলে।
২. মুখ ভরে বমি করলে।
৩. কোনো কিছুতে ঠেস দিয়ে বা শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লে।
৪. অজ্ঞান হলে।
৫. রক্ত বা পুঁজ বের হয়ে শরীর থেকে গড়িয়ে পড়লে।
৬. সালাতের মধ্যে উচ্চস্বরে হেসে ফেললে।

ওযু করা ফরজ। ওযু ছাড়া সালাত আদায় হয় না। ওযু সম্পর্কে আমরা সাবধান থাকব। ওযু নষ্ট হলে ওযু করে নেব।

পরিকল্পিত কাজ : ওযু নষ্ট হওয়ার কারণগুলো লিখবে।

গোসল (غَسْلٌ)

সুস্থ শরীর ও সুন্দর মনের জন্য পাকসাফ থাকা প্রয়োজন। কিন্তু নানা কাজে নানাভাবে শরীর ময়লা হয়, অপবিত্র হয়। তাই অস্বস্তি লাগে। এই ময়লা ও অপবিত্রতা দূর করার উত্তম উপায় হলো গোসল করা। পানি দিয়ে সারা শরীর ধোয়াকে গোসল বলে।

গোসল করলে গায়ের ঘাম ও ময়লা দূর হয়। দুর্গন্ধ দূর হয়। দেহমন পবিত্র হয়। মন ভালো থাকে। কাজে উৎসাহ আসে।

গোসলের নিয়ম

আমরা গোসলের শুরুতে দুই হাত ধুয়ে নেব। গড়গড়াসহ কুলি করে মুখ পরিষ্কার করব। পানি দিয়ে নাক সাফ করব। পরে সারা শরীর ভালো করে তিনবার ধুয়ে ফেলব। এভাবে গোসল করব।

গোসলের ফরজ

গোসলের ফরজ তিনটি। যথা:

১) গড়গড়াসহ কুলি করা,
২) পানি দিয়ে ভালোভাবে নাক সাফ করা।
৩) পানি দিয়ে সারা শরীর ধোয়া।

খেয়াল রাখতে হবে সারা শরীরের কোনো অংশ যেন শুকনা না থাকে। নিয়মিত গোসল করলে শরীর ভালো থাকে। গোসল করা আল্লাহ তায়ালার হুকুম। এটাও একটা ইবাদত।

পরিকল্পিত কাজ : গোসলের ফরজ কাজগুলোর তালিকা তৈরি করবে।

আযান (اَذَانٌ)

সালাত জামাআতের সাথে আদায় করতে হয়। মহানবি (স) জামাআতে সালাত আদায় করতে তাগিদ দিয়েছেন। জামাআতে সালাত আদায়ের জন্য কীভাবে ডাকতে হয় কেউ তা জানত না। মহানবি (স) সাহাবিদের নিয়ে একদিন পরামর্শে বসলেন, আলোচনা চলল। কেউ বললেন, সালাতের সময় হলে ঘণ্টা বাজানো হোক। কেউ বললেন, শিঙ্গায় ফুঁ দিয়ে ডাকা হোক। কেউ বললেন, আগুন জ্বালানো হোক। আরও অনেকেই অনেক কথা বললেন। মহানবি (স) কোনোটাই পছন্দ করলেন না।

২০২৫

গভীর রাত। সাহাবি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জায়েদ গভীর ঘুমে মগ্ন। তিনি স্বপ্ন দেখেন, একজন ফেরেশতা তাঁকে আযানের বাক্যগুলো শুনাচ্ছেন। ভোরে তিনি ঐ বাক্যগুলো মহানবি (স)-কে শুনালেন। আশ্চর্যের বিষয় ছিল, হযরত উমর (রা)ও একই স্বপ্ন দেখেছিলেন। বাক্যগুলো মহানবি (স)-এর খুব পছন্দ হলো। তিনি বললেন, 'এটা মহান আল্লাহরই নির্দেশ।'

মহানবি (স) হযরত বিলাল (রা)-কে আযান দিতে বললেন। হযরত বিলালের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো প্রথম আযান। হযরত বিলাল হলেন ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন।

আযানের বাক্যগুলো হলো:

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার,	اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ ،
আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার,	اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ ،
আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ	اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ	اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ	اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ
আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ	اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ
হাইইয়া আলাস সালাহ, হাইইয়া আলাস সালাহ	حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ - حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ -
হাইইয়া আলাল ফালাহ, হাইইয়া আলাল ফালাহ	حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ -
আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার	اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ ،
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -

অর্থ : আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। (দুইবার)

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসুল। (দুইবার)

সালাত আদায়ের জন্য এসো, সালাত আদায়ের জন্য এসো।

কল্যাণের জন্য এসো, কল্যাণের জন্য এসো।

২০২৫

আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।

ফজরের আযানে হাইইয়া আলাল ফালাহ–এর পর ঘুম ভাঙানো ডাক দেওয়া হয়। বলতে হয়:

আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ

আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ

অর্থ : ঘুম থেকে সালাত উত্তম, ঘুম থেকে সালাত উত্তম।

আযানের এই মর্মস্পর্শী ডাক শুনে কোনো মুমিনব্যক্তি বসে থাকতে পারে না। প্রকৃত মালিকের দরবারে হাজির হয়ে তাঁর সামনে মাথা নত না করে সে কিছুতেই শান্তি পায় না।

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেন :

বাজল কি রে ভোরের শানাই
নিদমহলা আঁধার পুরে।
শুনাই আযান গগনতলে
অতীত রাতের মিনার চূড়ে ॥

কবি কায়কোবাদ বলেন:

কে ওই শোনাল মোরে আযানের ধ্বনি
মর্মে মর্মে সেই সুর
বাজিল কী সুমধুর
আকুল হইল প্রাণ নাচিল ধমনী ॥

একক কাজ : শিক্ষার্থীরা আযানের বাক্যগুলো বাংলায় মার্কার দিয়ে পোস্টার পেপারে লিখবে।

আযানের শেষে এই দোয়া পড়তে হয় :

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَآئِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ
وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَانِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ. اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ দাওয়াতিত তাম্মাতি ওয়াসসালাতিল কাইমাতি আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়ালফাযীলাতা ওয়াদ্দারাজাতার রাফিয়াতা ওয়াবআসহু মাকামাম মাহমুদানিল্লাযী ওয়া আদতাহু। ইন্নাকা লা তুখলিফুল মীয়াদ।

মুয়াজ্জিন প্রতিদিন পাঁচবার আযান দেন। রেডিও-টেলিভিশনে আযান প্রচার করা হয়। আমরা তা মনোযোগ দিয়ে শুনব। আমরা আযান শুনে সালাতের জন্য তৈরি হব। সময়মতো সালাত আদায় করব।

ইকামত (إِقَامَةٌ)

আযান হলো সালাতের আহ্বান। আর ইকামত হলো জামাত শুরুর ঘোষণা। ইকামতের সাথে সাথে জামাআত শুরু হয়। ইকামতে আযানের বাক্যগুলোই বলতে হয়। শুধু হাইয়া আলাল ফালাহ্ বলার পর–

ক্বাদ কামাতিস সালাহ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ

ক্বাদ কামাতিস সালাহ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ

দুইবার বলতে হয়। এর অর্থ সালাত শুরু হলো।

তাশাহহুদ (تَشَهُّدٌ)

সালাতে দুই রাকআতের পর এবং শেষ বৈঠকে একটা দোয়া পড়তে হয়। এটিকে তাশাহহুদ বলে। দোয়াটি হলো :

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ
وَبَرَكَاتُهٗ ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ ۔ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۔

উচ্চারণ: আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াততায়্যিবাতু। আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। আশহাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।

অর্থ: আমাদের সব সালাম, শ্রদ্ধা, আমাদের সব সালাত এবং সব পবিত্রতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য। হে নবি! আপনার প্রতি সালাম, আপনার উপর আল্লাহর রহমত এবং অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। আমাদের ও আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর বান্দা এবং রাসুল।

দরুদ

সালাতে তাশাহহুদের পর দরুদ পড়তে হয়। দরুদ হলো–

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ
মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা	مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ
ওয়াআলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ	وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ
আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়াআলা আলি	اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ
মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা	مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ
ওয়াআলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ	وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

অর্থ: হে আল্লাহ! দয়া ও রহমত কর হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি যেমন তুমি রহমত দান করেছ হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই তুমি অতি উত্তম গুণের আধার এবং মহান। হে আল্লাহ! বরকত দান কর হযরত মুহাম্মদ (স) এবং তাঁর বংশধরদের উপর যেমন তুমি হযরত ইবরাহীম (আ) এবং তাঁর বংশধরদের উপরে করেছ। নিশ্চয়ই তুমি অতীব সদ্গুণের অধিকারী ও মহান।

দোয়া মাসুরা

কুরআন–হাদিসে বর্ণিত দোয়াগুলোকে দোয়া মাসুরা বলা হয়। সালাতে দোয়া মাসুরা পড়া ভালো। মহানবি (স) সালাতে দোয়া মাসুরা পাঠ করতেন। সালাতে দরুদের পর এই দোয়া পড়তে হয়।

আল্লাহুম্মা ইন্নি যালামতু নাফসী যুলমান কাসীরাওঁ	اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا
ওয়ালা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা ফাগফিরলী	وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِىْ
মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা ওয়ারহামনী ইন্নাকা	مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ
আনতাল গাফুরুর রাহীম।	اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর অধিক পরিমাণে জুলুম করেছি। তুমি ছাড়া আমার অপরাধ ক্ষমা করার ক্ষমতা কারো নেই।(অতএব আমি আমার অপরাধসমূহের জন্য তোমার নিকটই ক্ষমা প্রার্থনা করছি)। আমার উপর রহমত বর্ষণ কর, আমার উপর অনুগ্রহ কর। নিশ্চয়ই তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

সালাম (سَلَامٌ)

সালাতের শেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হলো সালাম। দোয়া মাসুরা পড়ার পর প্রথমে ডানে ও পরে বামে সালাম ফেরাতে হয়। সালামের বাক্যটি হলো :

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

অর্থ : তোমাদের উপর **শান্তি** ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

মুনাজাত (مُنَاجَاةٌ)

আল্লাহ তায়ালার কাছে আবেদন-নিবেদন, কাকুতি-মিনতি করাকে মুনাজাত বা দোয়া বলে। প্রত্যেক ফরজ সালাত শেষে মুনাজাত কবুল হওয়ার একটি উপযুক্ত সময়। এ সময় যে কোনো ভালো দোয়া করা যায়। কুরআন মজিদ ও হাদিস শরিফে অনেক মুনাজাত আছে। একটি সংক্ষিপ্ত এবং সুন্দর মুনাজাত হলো:

রব্বানা আতিনা ফিদদুনইয়া হাসানাতাওঁ ওয়াফিল رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى

আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আযাবান নার। الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের এ দুনিয়ায় কল্যাণ দাও আর আখিরাতেও কল্যাণ দাও এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা কর। - সূরা বাকারা-২০১

নামাজ শেষে মুনাজাত

সালাত (صَلٰوةٌ)

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো সালাত বা নামায। সালাতের কতকগুলো নিয়ম আছে। এই নিয়মগুলো পালন করা ফরজ।

সালাতের আহকাম (اَحْكَامُ الصَّلٰوةِ)

সালাত শুরুর আগে সাতটি ফরজ কাজ করতে হয়। এগুলোকে বলে সালাতের আহকাম। আহকাম ঠিকমতো পালন না করলে সালাত সঠিকভাবে আদায় হয় না।

১। শরীর পাক হওয়া ২। কাপড় পাক হওয়া ৩। সালাতের জায়গা পাক হওয়া

৪। সতর বা শরীরের নির্দিষ্ট অংশ ঢাকা ৫। কিবলামুখী হওয়া ৬। নিয়ত করা

৭। সময়মতো সালাত আদায় করা।

সালাতের ওয়াক্ত বা সময় (اَوْقَاتُ الصَّلٰوةِ)

সময়মতো সালাত আদায় করা আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ। সময়মতো আদায় না করলে সালাত আদায় হয় না। মহান আল্লাহ বলেন, " সঠিক সময়ে সালাত আদায় করা মুমিনের জন্য ফরজ।" সালাতের নির্দিষ্ট সময় হলো :

ফজর	রাত শেষে পূর্ব আকাশে সাদা আভা দেখা দিলে ফজর শুরু হয়। সূর্য উঠার পূর্ব মুহূর্তে তা শেষ হয়।
যোহর	দুপুরে সূর্য পশ্চিমে নামতে আরম্ভ করলে যোহর শুরু হয়। আর কোনো কাঠির ছায়া সে কাঠির মূলছায়া বাদে তার দ্বিগুণ হলে তা শেষ হয়।
আসর	যোহর শেষ হওয়ার সাথে সাথে আসর শুরু হয়। সূর্য ডোবার পূর্বে তা শেষ হয়।
মাগরিব	সূর্য ডোবার পর মাগরিব শুরু হয়। পশ্চিম আকাশে আলোর লাল আভা মুছে যাওয়ার সাথে সাথে তা শেষ হয়।
এশা	মাগরিব শেষ হওয়ার পর এশা শুরু হয়। ফজরের পূর্ব পর্যন্ত এশার সালাতের সময় থাকে। তবে মধ্য রাতের পূর্বে এশার সালাত পড়া ভালো।

সালাতের আরকান (أَرْكَانُ الصَّلٰوةِ)

সালাতের ভিতরে সাতটি ফরজ কাজ আছে। এগুলোকে সালাতের আরকান বলে। যথা:

১। তাকবির–ই–তাহরিমা বা আল্লাহু আকবার বলে সালাত শুরু করা।

২। কিয়াম অর্থাৎ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা। তবে কোনো কারণে দাঁড়াতে অক্ষম হলে বসে, এমনকি শুয়েও সালাত আদায় করা যায়।

৩। কিরাত অর্থাৎ কুরআন মজিদের কিছু অংশ তিলাওয়াত করা।

৪। রুকু করা।

৫। সিজদাহ্ করা।

৬। শেষ বৈঠকে বসা।

৭। সালাম-এর মাধ্যমে সালাত শেষ করা।

এর কোনো একটি বাদ পড়লে সালাত আদায় হয় না। তাই এগুলো আদায়ের ব্যাপারে আমরা খুবই সাবধান থাকব।

সালাত আদায়ের নিয়ম

সালাত সবচেয়ে বড় ইবাদত। মহানবি (স) যেভাবে সালাত আদায় করতেন আমরাও সেভাবে সালাত আদায় করব। আমরা সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়াব। আমাদের মুখ থাকবে পবিত্র কিবলার দিকে। আমরা পাকসাফ হয়ে সারা জাহানের বাদশাহ আল্লাহ তায়ালার দরবারে হাজির হব। সালাতে যা যা পড়ব তার অর্থ জেনে নেব।

কিবলামুখী হয়ে সালাতে দাঁড়ানোর দৃশ্য

সর্বপ্রথম বলব : আল্লাহু আকবার– اَللّٰهُ اَكْبَرُ

অর্থ: আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়।

মুখে এ বিরাট অঙ্গীকার করে পৃথিবীর যাবতীয় জিনিস হতে নিজের সম্পর্ক ছিন্ন করব। প্রতীক হিসেবে কান পর্যন্ত দুই হাত তুলব। এরপর সারা জাহানের বাদশাহর সামনে আল্লাহু আকবার বলে হাত বেঁধে দাঁড়াব।

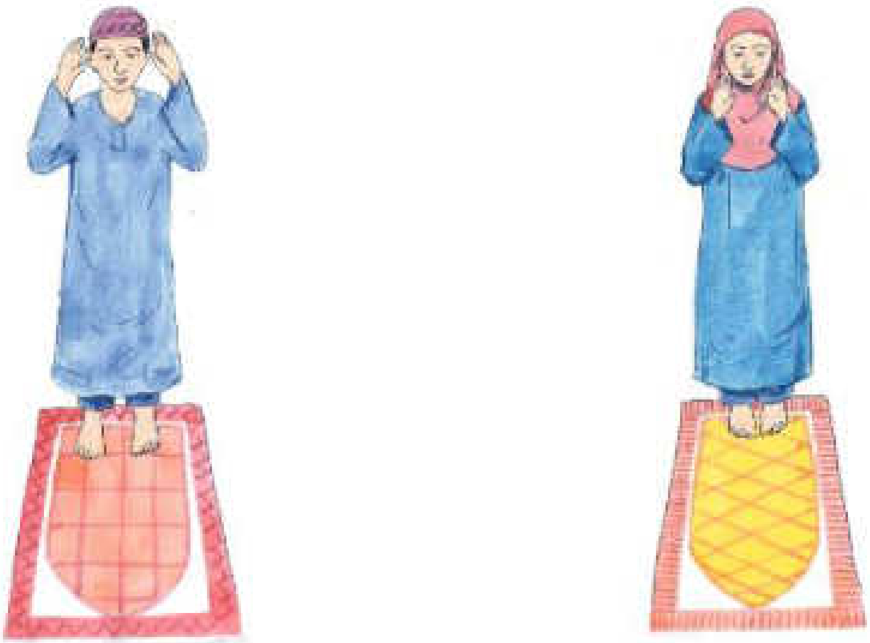

পুরুষ ও নারীর তাকবিরে তাহরিমার দৃশ্য

এরপর বিনয় সহকারে সানা পড়ব। সানা হলো—

সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়াতায়ালা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা।

এরপর আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজিম এবং বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়ব।

তারপর সূরা ফাতিহা পাঠ করে অন্য কোনো সূরা বা সূরার অংশ পাঠ করব। আল্লাহু আকবার বলে রুকু করব। রুকুতে তিনবার সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম পড়ব। সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ বলে সোজা হয়ে দাঁড়াব। দাঁড়ানো অবস্থায় রব্বানা লাকাল হামদ বলব। এরপর আল্লাহু আকবার বলে সিজদাহু করব।

এরপর আল্লাহু আকবার বলে সোজা হয়ে দাঁড়াব। সূরা ফাতিহা পাঠ করে অন্য কোনো সূরা পাঠ করব। পরে প্রথম রাকআতের মতো রুকু সিজদাহ্ করে স্থির হয়ে বসব। তাশাহহুদ, দরুদ ও দোয়া মাসুরা পাঠ করব। এরপর প্রথমে ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, পরে বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে বলব আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। এভাবে দুই রাকআত বিশিষ্ট সালাত আদায় করব।

সালাম ফেরানোর দৃশ্য

তিন বা চার রাকআত বিশিষ্ট সালাতের ক্ষেত্রে দুই রাকআত পড়ে বসব এবং তাশাহহুদ পাঠ শেষে–আল্লাহু আকবার বলে উঠে দাঁড়াব। তারপর আগের মতো তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআত পড়ব। তবে ফরজ সালাতের ক্ষেত্রে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করব।

মহানবি (স) জামাআতের সাথে সালাত আদায় করতেন। আমরাও জামাআতের সাথে সালাত আদায় করব।

জুমুআর সালাত

প্রতিদিন পাঁচবার মসজিদে জামাআত হয়। পাড়া–মহল্লার লোকজন একসাথে সালাত আদায় করেন। এতে পরস্পর দেখা–সাক্ষাৎ ও কুশলাদি বিনিময় হয়। সুখে–দুঃখে একে অন্যের সাহায্য–সহযোগিতার সুযোগ হয়।

প্রতি সপ্তাহে জামে মসজিদে আরও বড় আকারে জুমুআর জামাআত হয়। শুক্রবারে জুমুআর সালাতের জন্য অনেক মুসল্লির সমাবেশ ঘটে। আল্লাহপাক বলেন, "জুমুআর দিন আযান হলে সালাতের জন্য দ্রুত যাও। বেচাকেনা বন্ধ রাখ। সালাত শেষে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর রহমত তালাশ কর।"

মসজিদে নববী

জুমুআর দিন গোসল করা, ভালো পোশাক পরা ও আতরমাখা সুন্নত। এদিন যোহরের সালাতের পরিবর্তে জুমুআর দুই রাকআত সালাত ফরজ।

ফরজ সালাতের আগে চার রাকআত কাবলাল জুমুআ সালাত পড়া সুন্নত। ফরজের পর চার রাকআত বাদাল জুমুআ সালাত পড়াও সুন্নত। এ ছাড়া সময় পেলে নফল সালাত পড়াও উত্তম।

জুমুআর সালাত যোহরের ওয়াক্তেই জামাআতে আদায় করতে হয়। জামাআত ছাড়া জুমুআর ফরজ আদায় হয় না।

জুমুআর জন্য দুটি আযান দেওয়া হয়। প্রথম আযান মিনারায় বা মসজিদের বাইরে দিতে হয়। ইমাম সাহেব খুতবা দিতে মিম্বারে বসলে দ্বিতীয় আযান দিতে হয়। এরপর ইমাম মিম্বারে দাঁড়িয়ে দুটি খুতবা দেন। খুতবা অর্থ বক্তৃতা। খুতবায় ইসলামের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হয়।

খুতবা শোনা ওয়াজিব। এ সময় কথা বলা বা অন্য কিছু করা যায় না। এমনকি সালাত আদায় করাও নিষেধ।

খুতবা শেষে ইমামের সাথে দুই রাকআত ফরজ সালাত আদায় করতে হয়। ফরজের আগে নিয়ত করব, "আমি কিবলামুখি হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে দুই রাকআত জুমুআর ফরজ সালাত এই ইমামের সাথে পড়ার নিয়ত করলাম আল্লাহু আকবার।" তবে নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা বা পড়া আবশ্যক নয়।

অতএব জুমুআর সালাত মোট দশ রাকআত। চার রাকআত কাবলাল জুমুআ সুন্নত। দুই রাকআত ফরজ। চার রাকআত বাদাল জুমুআ সুন্নত।

ঈদের সালাত

ঈদ হলো খুশির দিন। বিশ্বের মুসলিমগণ দুটি ঈদ উৎসব পালন করেন। একটি রোযার শেষে ঈদুল ফিতর। আরেকটি হলো কুরবানির ঈদুল আযহা। ঈদের দিন সারা এলাকার মুসল্লিগণ ঈদগাহে একত্রিত হন। দুই রাকআত ঈদের সালাত আদায় করে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ঈদের সালাত পড়া ওয়াজিব।

ঈদুল ফিতর

পবিত্র রমযান মাসে সিয়াম সাধনার পর শাওয়াল মাসের প্রথম দিন হলো ঈদুল ফিতর এর দিন। ঈদ অর্থ আনন্দ। ফিতর অর্থ রোযা ভঙ্গ করা। দীর্ঘ একমাস সাওম পালনের তাওফিক দানের জন্য মুসলিমগণ এদিন আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এটি নিছক আনন্দ উৎসবের দিন নয়।

এদিন পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও গরিব-দুঃখীর খোঁজখবর নিতে হয়। বিধবা, ইয়াতীম ও অসহায়ের মুখে সাধ্যমতো হাসি ফোটানোর চেষ্টা করতে হয়। ধনীদের উপর এদিন সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। ঈদের দিনে রোযা রাখা হারাম।

ঈদের দিনের সুন্নত: সকালে গোসল করা, খুশবুমাখা, পরিষ্কার কাপড় পরা, মিষ্টি জাতীয় কিছু খাওয়া, ঈদের সালাত মাঠে আদায় করা প্রভৃতি।

ইমামের সাথে দুই রাকআত ঈদুল ফিতরের সালাত আদায় করা ওয়াজিব। এতে ছয়টি অতিরিক্ত ওয়াজিব তাকবির দিতে হয়।

ঈদের সালাত আদায় করার নিয়ম

প্রথমে কাতার করে ইমামের পিছনে দাঁড়াব। নিয়ত করব। আল্লাহু আকবার বলে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে তাহরিমা বাঁধব। সানা পাঠ করব। এরপর কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে ইমামের সাথে তিন তাকবির দিব। প্রথম দুইবার হাত না বেঁধে ছেড়ে রাখব। তৃতীয় তাকবির দিয়ে সালাতে হাত বাঁধার মতো দুই হাত বাঁধব। এরপর ইমাম সাহেব অন্যান্য সালাতের মতো সূরা ফাতিহা ও যেকোনো সূরা পাঠ করবেন এবং যথারীতি রুকু সিজদাহ্ করে প্রথম রাকআত শেষ করবেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাকআতে ইমাম সাহেব সূরা ফাতিহা ও যেকোনো সূরা পাঠ করবেন। এরপর তিন তাকবির দিবেন। আমরাও তিনবার আল্লাহু আকবার বলব। তিনবারই কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে নামিয়ে রাখব, হাত বাঁধব না। পরে চতুর্থবার আল্লাহু আকবার বলে রুকু করব।

এরপর অন্যান্য সালাতের মতো সিজদাহ্ করব, তশাহহুদ, দরুদ ও দোয়া মাসুরা পাঠ করে ইমামের সাথে সালাম ফিরাব। সালাত শেষে ইমাম সাহেব দুইটি খুতবা দেবেন। খুতবা শোনা ওয়াজিব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা ঈদুল ফিতর-এর দিনের করণীয় কাজগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

ঈদুল আযহা

দ্বিতীয় ঈদ হলো ঈদুল আযহা বা কুরবানির ঈদ। মুসলমানদের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। আল্লাহর নির্দেশে এদিন হযরত ইবরাহীম (আ) নিজপুত্র হযরত ইসমাঈল (আ)-কে আল্লাহর নির্দেশে কুরবানি করতে তৈরি হন। তাঁর এ ত্যাগের স্মৃতি স্বরূপ মুসলমানের উপর

কুরবানি ওয়াজিব করা হয়েছে।

যিলহজ মাসের দশম তারিখ ঈদুল আযহার দিন। ঈদুল ফিতরের মতো এদিনও গোসল করে খুশবু মেখে পরিষ্কার কাপড় পরে ঈদগাহে একই নিয়মে দুই রাকআত ওয়াজিব সালাত আদায় করতে হয়। সালাত শেষে ইমাম দুইটি খুতবা দেন। খুতবা শোনা ওয়াজিব। এদিন সালাতের আগে কিছু না খাওয়া ভালো। রাস্তায় জোরে জোরে তাকবির পড়া সুন্নত।

ঈদের তাকবির হলো: আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

যিলহজ মাসের নবম তারিখ ফজর থেকে তের তারিখ আসর পর্যন্ত ফরজ সালাত শেষে এই তাকবির পড়া ওয়াজিব। ঈদুল ফিতরের দিন এই তাকবির আস্তে আস্তে পড়তে হয়।

সালাত শেষে পশু কুরবানি করতে হয়। কুরবানির গোশত তিন ভাগ করে একভাগ নিজের জন্য রাখব, একভাগ আত্মীয়দের মাঝে বিতরণ করব ও আরেক ভাগ গরিবদের মাঝে বণ্টন করব। এভাবে ঈদের খুশিতে সবাই শরিক হতে পারে। এতে সমাজে মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

আমরা ঈদের এ মহান শিক্ষা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করব। সবার সঙ্গে মিলেমিশে ঈদের আনন্দ উপভোগ করব। ঈদের এ শিক্ষাকে সমাজে ছড়িয়ে দেব।

অনুশীলনী

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন:

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও

১। ওযুর ফরজ কয়টি?

ক. ৩টি খ. ৪টি

গ. ৫টি ঘ. ৬টি

২। সালাতের আরকান কয়টি?

ক. ৭টি খ. ৬টি

গ. ৫টি ঘ. ৪টি

৩। সালাতের আহকাম কয়টি?

ক. ৪টি খ. ৫টি

গ. ৬টি ঘ. ৭টি

৪। সালাত কয় ওয়াক্ত ?

ক. ৬ ওয়াক্ত খ. ৭ ওয়াক্ত

গ. ৫ ওয়াক্ত ঘ. ৩ ওয়াক্ত

৫। সালাতে দরুদ কখন পড়তে হয়?

ক. দাঁড়ানো অবস্থায় খ. সিজদাহ্ অবস্থায়

গ. রুকুতে ঘ. শেষ বৈঠকে

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক. পবিত্রতা ------ অঙ্গ।

খ. তাহারাত অর্থ ----।

গ. সালাতের আগে ---- করতে হয়?

ঘ. ওযু ছাড়া ---- হয় না।

ঙ. জুমুআর ----- রাকআত সালাত ফরজ।

গ. রেখা টেনে মেলাও :

১) আল্লাহ ছাড়া কারো	চারটি
২) পবিত্রতা ঈমানের	সালাত
৩) ওযুর ফরজ	আনন্দ
৪) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো	অঙ্গ
৫) ঈদ অর্থ	ইবাদত করব না

২০২৫

সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম লেখ।

২. আসসালাতু খাইরুম মিনান নাওম এর অর্থ কী?

৩. মাগরিব নামাযের ওয়াক্ত কখন শুরু ও শেষ হয়?

৪. ঈদের দিনের সুন্নত কাজগুলো কী কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন:

১. ইবাদত শব্দের অর্থ কী? ইবাদত কাকে বলে ?

২. ওযুর ফরজ কয়টি ও কী কী?

৩. আযানের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৪. সালাতের আহকাম কয়টি ও কী কী লেখ।

৫. সালাতের আরকান কয়টি ও কী কী?

৬. ঈদের সালাতের সামাজিক তাৎপর্য লেখ।

তৃতীয় অধ্যায়

আখলাক (اَلْاَخْلَاقُ)

মানুষের স্বভাব ও চরিত্রকে আরবিতে আখলাক বলে। চরিত্র ভালো হলে জীবন সুন্দর হয়। সুখের হয়। আখিরাতে শান্তি পাওয়া যায়। সুখ পাওয়া যায়। সুন্দর ও ভালো চরিত্রই সচ্চরিত্র। যেমন সত্য কথা বলা। রোগীর সেবা করা। আব্বা–আম্মাকে সম্মান করা। প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করা।

মন্দ স্বভাব ও খারাপ চরিত্রকে অসচ্চরিত্র বলা হয়। চরিত্র অসৎ হলে কেউ তাকে ভালোবাসে না। সকলে ঘৃণা করে। তার সাথে কেউ মেলামেশা করে না। খেলা করে না। আল্লাহ তাকে অপছন্দ করেন। মন্দ স্বভাব ও খারাপ চরিত্র হলো মিথ্যা কথা বলা, লোভ করা, অপচয় করা, পরনিন্দা করা ইত্যাদি।

আমাদের মহানবি (স) ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"

মহানবি (স) বলেন, "সত্যিকার মুমিন তারাই, যাদের চরিত্র সুন্দর।"

নিচে সচ্চরিত্র এবং অসচ্চরিত্রের একটি তালিকা দেওয়া হলো :

	সচ্চরিত্রের তালিকা		অসচ্চরিত্রের তালিকা
১	আব্বা–আম্মার সাথে ভালো ব্যবহার করা	১	আব্বা-আম্মার সাথে খারাপ ব্যবহার করা
২	শিক্ষককে সম্মান করা	২	লোভ করা
৩	বড়দের সম্মান করা	৩	অপচয় করা
৪	ছোটদের স্নেহ করা	৪	পরনিন্দা করা
৫	সত্য কথা বলা ও ওয়াদা পূরণ করা	৫	অহংকার করা
৬	সালাত আদায় করা	৬	সালাত আদায় না করা

আমরা চরিত্র সুন্দর করব। তাহলে সকলে আমাদের ভালোবাসবে। আল্লাহ আমাদের উপর খুশি হবেন। দুনিয়াতে আমরা শান্তি পাব। পরকালে পাব জান্নাত।

আমরা সর্বদা–

ইমানের ওপর অটল থাকব, সালাত আদায় করব।
আব্বা–আম্মা, শিক্ষক ও বড়দের সম্মান করব।
ছোটদের স্নেহ করব, সত্যকথা বলব।
স্বভাব চরিত্র সুন্দর রাখব, শান্তি পাব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা সচ্চরিত্রের একটি তালিকা তৈরি করবে।

আব্বা–আম্মাকে সম্মান করা

আব্বা–আম্মা আমাদের সবচেয়ে আপনজন। তাঁরা আমাদের জন্য অনেক কষ্ট করেন। স্নেহ–মমতা ও দরদ দিয়ে লালন-পালন করেন। না খেয়ে আমাদের খাওয়ান। আমাদের অসুখ–বিসুখ হলে তাঁরা সেবাযত্ন করেন। সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। আমাদের সুখে তারা সুখী হন। আনন্দ পান। আমাদের কষ্টে তাঁরা কষ্ট পান। দুঃখ পান। তারা সবসময় আমাদের কল্যাণ কামনা করেন। দোয়া করেন।

সবসময় আব্বা–আম্মার সাথে ভালো ব্যবহার করা আমাদের কর্তব্য। আমরা তাঁদের সম্মান করব। শ্রদ্ধা করব। তাঁদের সাথে রাগারাগি করব না। ঝগড়া-বিবাদ করব না। কর্কশ ভাষায় কথা বলব না। তাঁদের মনে কষ্ট দেব না। সব সময় হাসিমুখে কথা বলব। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় আব্বা–আম্মাকে সালাম দিয়ে বের হব। আবার বাড়িতে ফিরে আসলে আব্বা–আম্মাকে সালাম জানাব। সুন্দর সুন্দর কথা বলব।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, "قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (কুল লাহুমা ক্বাওলান কারীমা)।"

অর্থ : তুমি আব্বা–আম্মার সাথে সুন্দর সুন্দর কথা বল।

তাঁদের ভালো খাওয়া–পরার ব্যবস্থা করব। তাঁদের অসুখ হলে সেবাযত্ন করব। তাঁদের আদেশ–নিষেধ মেনে চলব। তাঁরা বুড়ো হয়ে গেলে তাঁদের সাথে খুব ভালো ব্যবহার করব। তাঁদের কাজে ও চলাফেরায় সাহায্য করব।

আল্লাহ বলেন, "وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (ওয়াবিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা)।"

অর্থ: আব্বা–আম্মার সাথে উত্তম ব্যবহার করো।

আব্বা–আম্মার মৃত্যুর পর তাঁদের প্রতি আমাদের অনেক কর্তব্য রয়েছে। তাঁদের জিম্মায় যদি কোনো ঋণ থাকে তাহলে তা পরিশোধ করব। দান–খয়রাত এবং নফল ইবাদত করে তাঁদের আত্মার মাগফেরাত চাইব। মঙ্গল কামনা করব। আমরা সবসময় আব্বা–আম্মার জন্য দোয়া করব—

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا. (রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানী সাগীরা)।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক, আমার আব্বা–আম্মা আমাকে ছোটবেলায় যেমনি সেবাযত্নে লালন-পালন করেছেন, আপনি তাঁদের প্রতি তেমনি দয়া করুন।

মহানবি (স) বলেছেন, "মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত।"

আমরা সর্বদা–

আব্বা–আম্মার কথা শুনব ও মানব ।
তাঁদের শ্রদ্ধা করব, সম্মান করব।
তাঁদের অবাধ্য হব না।
তাঁদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করব।

পরিকল্পিত কাজ: কী কী উপায়ে আব্বা–আম্মার সম্মান করা যায়, শিক্ষার্থীরা তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

শিক্ষককে সম্মান করা (إِكْرَامُ الْمُعَلِّمِ)

আব্বা–আম্মার মতো শিক্ষক আমাদের প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তোলেন। তিনি আমাদের কুরআন, সালাত ও আদব–কায়দা শেখান। তিনি সৎ ও ন্যায়ের পথে চলতে শেখান। অন্যায় ও অসৎ পথে চলতে নিষেধ করেন। তিনি আমাদের আপনজন। আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা করব।

কেমনভাবে লিখতে হয়, কীভাবে পড়তে হয়, এসব শিক্ষক আমাদের শেখান। জ্ঞান–বিজ্ঞানের নানা বিষয় আমরা তাঁর কাছে শিখি। কুরআন ও হাদিসের কথা শিখি। দেশ ও দশের কথা শিখি। আমরা তাঁকে সম্মান করব। তাঁকে মর্যাদা দেব।

শিক্ষকের সাথে সব সময় ভালো ব্যবহার করব। তাঁর সাথে দেখা হলে তাঁকে সালাম দেব। তাঁকে ভালোমন্দ জিজ্ঞাসা করব। তিনি শ্রেণিকক্ষে যা পড়াবেন মনোযোগ দিয়ে শুনব। তাঁর সাথে সবসময় নম্রভাবে কথা বলব। তিনি শ্রেণিতে থাকা অবস্থায় যদি বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে তাঁর অনুমতি নিয়ে যাব। তিনি অসুস্থ হলে তাঁকে দেখতে যাব।

২০১৫

তাঁর সেবাযত্ন করব। তাঁর আদেশ-উপদেশ মেনে চলব। তাঁর সাথে কখনো বেয়াদবি করব না। সব সময় তাঁর কথা শুনব। তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করব।

আমরা ওয়াদা করব,

শিক্ষকের আদেশ–উপদেশ মানব
তাঁকে সালাম দেব, তাঁর সেবা করব
তিনি যা শেখাবেন মন দিয়ে শিখব
তাঁকে সম্মান করব, দোয়া করব।

বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করা (إِكْرَامُ الْكِبَارِ وَارْحَامُ الصِّغَارِ)

আব্বা–আম্মা আমাদের আদর করেন। দাদা–দাদি ও নানা–নানি আদর করেন। শিক্ষক আমাদের স্নেহ করেন। যারা বয়সে বড় তাঁরা আমাদের ভালোবাসেন। স্নেহ করেন। আমরা বড়দের সম্মান করব।

যেসব ছেলেমেয়েরা আমাদের উপরের শ্রেণিতে পড়ে আমরা তাদের সম্মান করব। আমাদের বাড়ির যেসব কাজের লোক বয়সে বড় আমরা তাঁদের শ্রদ্ধা করব। সম্মান করব।

যাঁরা বয়সে বড় তাঁদের সাথে দেখা হলে আমরা তাঁদের সালাম দেব। আদবের সাথে কথা বলব। ভালো ব্যবহার করব। আদেশ–উপদেশ মেনে চলব।

আমাদের ছোট ভাইবোন আছে। নিচের শ্রেণিতে অনেক ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করে। যারা আমাদের চেয়ে বয়সে ছোট, আমরা তাদের আদর করব। স্নেহ করব। তাদের ভালো কথা শেখাব। তাদের কাঁদাব না। মারব না। গালি দেব না। তাদের সালাম দেওয়া শেখাব। পড়া বলে দেব।

বাস, স্টিমার বা অন্য কোনো যানবাহনে বৃদ্ধ লোক উঠেন। অনেকে বসার জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। আমরা বসে থাকলে উঠে দাঁড়াব। তাঁদের বসতে দেব। তাঁরা খুশি হবেন। আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ খুশি হবেন।

মহানবি (স) বড়দের সম্মান করতেন। ছোটদের স্নেহ করতেন। সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করতেন। মহানবি (স) বলেন, "যে ছোটদের স্নেহ করে না, আর বড়দের প্রতি সম্মান দেখায় না, সে আমার উম্মত নয়।"

আমরা সর্বদা–

বড়দের শ্রদ্ধা ও সম্মান করব
ছোটদের আদর ও স্নেহ করব
বড় ও ছোটর মধ্যে ভালো সম্পর্ক গড়ব
আল্লাহকে খুশি রাখব।

পরিকল্পিত কাজ: কীভাবে বড়দের সম্মান এবং ছোটদের স্নেহ করতে হয় শিক্ষার্থীরা তা খাতায় লিখবে।

প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার (حُسْنُ السُّلُوْكِ بِالْجَارِ)

আমাদের আশেপাশে যারা বসবাস করে তারা আমাদের প্রতিবেশী। বাস, ট্রেন, লঞ্চ, স্টিমারে সহযাত্রীরাও এক ধরনের প্রতিবেশী। বিভিন্ন ছাত্রাবাসে অবস্থানকারী ছাত্রছাত্রীরা একে অপরের প্রতিবেশীর মতো।

আমরা প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করব। তাদের সাথে কুশল বিনিময় করব। কেউ ক্ষুধার্ত হলে তাকে খাদ্য দেব। মহানবি (স) বলেছেন, "যে নিজে পেটভরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে সে মুমিন নয়।"

প্রতিবেশী অসুস্থ হলে সেবা করব। বিপদে সাহায্য করব। তাদের যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ করে দেব না। তাদের সুখে খুশি হব। তাদের কষ্টে কষ্ট পাব। যেখানে সেখানে ময়লা–আবর্জনা ফেলব না। প্রতিবেশীদের কথা ভেবে হই-হুল্লা করা, উচ্চশব্দে মোবাইলে কথা বা টেলিভিশন বাজানো থেকে বিরত থাকব।

প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া করব না। কষ্ট দেব না। হিংসা করব না। মিলেমিশে থাকব। তাহলে পরিবেশ সুন্দর হবে। সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। আল্লাহ খুশি হবেন। পরকালে জান্নাত পাওয়া যাবে। আর যদি প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া করি, হিংসা করি তাহলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন। দুনিয়াতে শান্তি পাব না। পরকালেও শান্তি পাব না।

২০২৫

মহানবি (স) বলেন, "যার অত্যাচার ও অন্যায় আচরণ থেকে তার প্রতিবেশী রক্ষা পায় না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

কোনো প্রতিবেশীর মৃত্যু হলে তার বাসায় যাব। বাসার সবাইকে সান্ত্বনা দেব। সহানুভূতি জানাব। জানাজায় শরিক হব। যদি প্রতিবেশী হিন্দু, বৌদ্ধ বা অন্য ধর্মের লোক হয়, তাদের সাথেও সুন্দর ব্যবহার করব। সকল প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করলে আল্লাহ খুশি হবেন। মহানবি (স) বলেন, "আল্লাহর কাছে সেই প্রতিবেশী সবচেয়ে উত্তম, যে তার প্রতিবেশীর কাছে উত্তম।"

আমরা সর্বদা–

প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করব, বিপদে সাহায্য করব, অসুখ হলে সেবা করব, ঝগড়া করব না, কষ্ট দেব না, মিলেমিশে থাকব, শান্তি বজায় রাখব।

পরিকল্পিত কাজ: প্রতিবেশীর প্রতি যেসব কর্তব্য পালন করতে হয় শিক্ষার্থীরা তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

রোগীর সেবা করা (عِيَادَةُ الْمَرِيْضِ)

আমাদের বাড়িতে আব্বা–আম্মা, দাদা–দাদি, ভাইবোন আছেন। বাড়ির আশেপাশে প্রতিবেশীরা আছেন। বিদ্যালয়ে সহপাঠীরা আছে। আত্মীয়– স্বজন ও খেলার সাথি আছে।

আমাদের মধ্যে কারও জ্বর হয়। নানা রকমের রোগ হয়। অসুখ হয়। আমরা বিভিন্ন সময়ে অসুস্থ হয়ে যাই। শরীর দুর্বল হয়ে যায়। অসহায় বোধ করি। জ্বর হলে ভীষণ খারাপ লাগে। কোনো কিছু খেতে ভালো লাগে না। তখন চিকিৎসার দরকার। ডাক্তার ডাকা দরকার। সেবাযত্নের প্রয়োজন। জ্বর হলে মাথায় পানি দেওয়া প্রয়োজন। জ্বরের মাত্রা বেশি হলে সমস্ত শরীর ভেজা কাপড় দিয়ে মুছিয়ে দিতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শে ওষুধ খেতে হবে। রোগীর সেবা করতে হবে। ইনশাআল্লাহ রোগ ভালো হয়ে যাবে। রোগ থেকে মুক্তি পাবে।

অসুখ–বিসুখ ও রোগশোক আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনের জন্য একটি পরীক্ষা। রোগীর সেবা করতে হবে। চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। মহানবি (স) সবসময় রোগীর সেবা করতেন।

মহানবি (স) বলেছেন, "عُوْدُوْا الْمَرِيْضَ" অর্থ, তোমরা রোগীর সেবা কর।

ফুয়াদ খুব ভালো ছেলে। একবার তার আম্মার ভীষণ জ্বর হলো। বাসায় আর কেউ নেই। সে তার আম্মার চিকিৎসার জন্য ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসলো। ডাক্তার সাহেব তার আম্মাকে

অসুস্থ মায়ের সেবা করছে তাঁর সন্তান

পরীক্ষা করে বলল, "ফুয়াদ, তোমার আম্মার মাথায় পানি দাও। আর এই ওষুধ সময়মতো খাওয়াবে। ইনশাআল্লাহ ভালো হয়ে যাবে।" ফুয়াদ সময়মতো তার আম্মাকে ওষুধ খাওয়াল। মাথায় পানি দিল। আল্লাহর কাছে তার আম্মার আরোগ্য লাভের জন্য দোয়া করল। আল্লাহর রহমতে তার আম্মা সুস্থ হয়ে উঠলেন। ফুয়াদ আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করল।

আমরা রোগীর সেবাযত্ন করব, তার খোঁজখবর নেব, আল্লাহর কাছে আরোগ্যের জন্য দোয়া করব।

পরিকল্পিত কাজ: কী কী উপায়ে রোগীর সেবা করা যায় শিক্ষার্থীরা তা খাতায় লিখবে।

সত্যকথা বলা (قَوْلُ الصِّدْقِ)

সত্যকথা বলা মহৎ গুণ। যে সত্যকথা বলে তাকে সত্যবাদী বলে। সত্যবাদীকে আরবিতে সাদিক (صَادِقٌ) বলা হয়।

যে সত্যকথা বলে তাকে সকলে ভালোবাসে। সকলে বিশ্বাস করে। আল্লাহও তাকে ভালোবাসেন। সে আল্লাহর কাছে প্রিয়। পৃথিবীতে সে সকলের কাছে প্রিয় ও সম্মানিত। পরকালে সে জান্নাত লাভ করবে।

২০১৫

মিথ্যা সকল পাপের মূল। যে মিথ্যাকথা বলে তাকে মিথ্যাবাদী বলে। আরবিতে তাকে কাযিব (كَاذِبٌ) বলা হয়। মিথ্যাবাদীকে কেউ ভালোবাসে না। বিশ্বাস করে না। সকলে তাকে ঘৃণা করে। অপছন্দ করে। তার বিপদে কেউ সাহায্য করে না। আল্লাহও তাকে ঘৃণা করেন। পরকালে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম।

আমাদের মহানবি (স) ছোটবেলা থেকে আজীবন সকলের কাছে সত্যবাদী বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি সবসময় সত্যকথা বলেছেন। অন্যদেরকে সত্যকথা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন। উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেননি। তাই সকলে তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করত।

মহানবি (স) বলেন, "সত্য মানুষকে মুক্তি দেয়, আর মিথ্যা ধ্বংস করে।" মহানবি (স) আরও বলেন, "তোমরা সবসময় সত্য বলবে। কেননা সত্য পুণ্যের পথে নিয়ে যায়। আর পুণ্য জান্নাতে নিয়ে যায়।"

একটি ঘটনা

একদিন মহানবি (স)–এর কাছে একজন লোক এসে বলল, 'হে আল্লাহর নবি (স), আমি চুরি করি। মিথ্যা কথা বলি। আরও অনেক অন্যায় করি। এখন আমি এগুলো ছেড়ে দিতে চাই। বলুন, আমি প্রথমে কোনটি ছেড়ে দেব?'

মহানবি (স) বললেন, "মিথ্যা কথা বলা ছেড়ে দাও।" লোকটি মিথ্যা কথা বলা ছেড়ে দিল। আর মিথ্যা বলা ছেড়ে দেওয়ার কারণে সব অন্যায় থেকে সে বেঁচে গেল।

আমরাও সবসময় সত্য কথা বলব। তাহলে সকলের সম্মান ও আদর পাব। মিথ্যাকথা বলব না। জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাব।

পরিকল্পিত কাজ: সত্যকথার সুফল এবং মিথ্যা বলার কুফল শিক্ষার্থীরা খাতায় লিখবে।

ওয়াদা পালন করা

ওয়াদা পালন করা অর্থ কথা দিয়ে কথা রাখা। কথামতো কাজ করা। চুক্তি রক্ষা করা। কারও সাথে কোনো কথা দিলে তা রক্ষা করার নাম ওয়াদা পালন করা।

আমরা কথাবার্তায় বা কাজকর্মে কারও সাথে কোনো কথা দিয়ে থাকলে বা চুক্তি করলে তা পূরণ করব। তাহলে সবাই আমাদের বিশ্বাস করবে। ভালোবাসবে। আল্লাহও খুশি হবেন।

আল্লাহ বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা ওয়াদা পূরণ কর।"

যে ওয়াদা পালন করে সে সকলের কাছে প্রিয় হয়। সম্মানিত হয়। সকলে তাকে বিশ্বাস

করে, ভালোবাসে। বিপদে পড়লে সাহায্য করে। আল্লাহ তার প্রতি খুশি থাকেন। আখিরাতে সে সুখ পায়। শান্তি পায়। জান্নাত লাভ করে।

ওয়াদা পালন না করা খুবই অন্যায়। মারাত্মক অপরাধ। যে ওয়াদা পালন করে না তাকে কেউ ভালোবাসে না। বিশ্বাস করে না। বিপদে সাহায্য করে না। সম্মান করে না। আল্লাহও তাকে ভালোবাসেন না। আখিরাতে সে কষ্ট পাবে। সে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে।

আমাদের মহানবি (স) কাউকে কোনো কথা দিলে তা রক্ষা করতেন। ওয়াদা করলে তা পালন করতেন। মহানবি (স) এবং কুরাইশদের মধ্যে হুদাইবিয়ার সন্ধি হয়েছিল। কুরাইশগণ সন্ধির শর্ত অমান্য করলে মহানবি (স) এ সন্ধি বাতিল করে দেন।

মহানবি (স) বলেন, "যে ওয়াদা পালন করে না, তার ধর্ম দীন নেই।"

আমরা কথা দিয়ে কথা রাখব, ওয়াদা পালন করব। কথামতো কাজ করব, মানুষের ভালোবাসা লাভ করব। কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করব না, অবিশ্বাসী হব না। আল্লাহর প্রিয় হব, জান্নাত লাভ করব।

পরিকল্পিত কাজ : ওয়াদা পালনের সুফল শিক্ষার্থীরা খাতায় লিখবে।

লোভ না করা (تَرْكُ الْحِرْصِ)

অনেক মানুষ যত পায় ততও চায়। বেশি বেশি চায়। এর নামই লোভ। লোভ করা পাপ। লোভ আমাদের অনেক ক্ষতি করে। অনেক অশান্তি সৃষ্টি করে। দুঃখ-কষ্ট বাড়ায়। লোভের কারণে মানুষ নানা অন্যায়ে লিপ্ত হয়। পাপ করে। লোভী ব্যক্তি সে সুখী হয় না। কখনো শান্তি পায় না।

যে লোভ করে তাকে লোভী বলে। লোভী মানুষকে কেউ ভালোবাসে না। সম্মান দেয় না। সকলে তাকে ঘৃণা করে। কেউ তার সাথে বন্ধুত্ব করে না। মেলামেশা করে না। তার বিপদে কেউ সাহায্য করে না। সে পাপী। আর এই পাপ তাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। কথায় বলে- 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।'

একটি কাহিনি শুনব

হযরত দাউদ (আ)-এর উপর যাবুর কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল। তিনি মধুর কণ্ঠে কিতাব পড়তেন। আর তা শোনার জন্য শনিবারে সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত তীরের কাছে চলে আসত। শনিবার মাছ ধরা নিষেধ ছিল। কিন্তু কিছু লোভী লোক সে নিষেধ অমান্য করল। তারা শুক্রবারে ফাঁদ

পেতে মাছ আটকে রাখল এবং পরে ধরল। এভাবে তারা অন্যায় করল। ফলে তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এল । এই লোভের কারণে তারা ধ্বংস হয়ে গেল।

মহানবি (স)–এর মধ্যে কোনো লোভ-লালসা ছিল না। তিনি বলেন, "তোমরা লোভ থেকে সাবধান থাক। লোভ তোমাদের পূর্ববর্তী অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছে।"

আমরা লোভ করব না,
ধ্বংস হব না।

পরিকল্পিত কাজ: লোভ–লালসার অপকার সম্বন্ধে শিক্ষার্থীরা একটি কাহিনি খাতায় লিখবে।

অপচয় না করা (تَرْكُ الْإِسْرَافِ)

অপচয় অর্থ ক্ষতি, অপব্যয়, নষ্ট। বিনা প্রয়োজনে কোনো কিছু নষ্ট করাকে অপচয় বলে। অপচয় করা বড় পাপ।

আল্লাহ বলেন, "إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ (ইন্নাল মুবাজ্জিরীনা কানূ ইখওয়ানাশ শায়াতীন)।"

অর্থ : নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই।

আমরা অনেক সময় অনেক জিনিস নষ্ট করি। অপচয় করি। প্রয়োজনের বেশি খাবার নিই। খেতে পারি না। ফেলে দেই। বিনা প্রয়োজনে স্কুলের ও ঘরের বাতি জ্বালিয়ে রাখি। ফ্যান চালাই। পানির কল খুলে রাখি। এতে বিদ্যুৎ অপচয় হয়। পানি নষ্ট হয়। অকারণে গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখি। মনে করি যে, একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি বেঁচে গেল। কিন্তু এতে প্রচুর গ্যাস অপচয় হলো।

আমাদের মধ্যে অনেকে বাজি পোড়ায়। পটকা ফোটায়। এসব অপচয়। অনেকে বিড়ি-সিগারেট খায়। এগুলো খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এগুলো খেলে ক্যান্সার হয়। টাকা-পয়সার অপচয় হয়। অনেকে দুষ্টামি করে খড়কুটায় আগুন দেয়। এতে অনেক সময় বিপদ ঘটে। ঘরে আগুন লাগে। দোকানে আগুন লাগে। এ সবকিছুই অপচয়।

আমরা কোনোকিছু অপচয় করব না। আমরা প্রয়োজনের বেশি কিছু করব না। নেব না। নষ্ট করব না। অপব্যয় করব না। অপচয় করা থেকে বিরত থাকব। তাহলে কম খরচ হবে। অভাব দূর হবে। সুখ-শান্তি থাকবে। ব্যক্তিগত ও জাতীয় সম্পদ রক্ষা পাবে। আল্লাহ খুশি হবেন।

আমরা কোনো জিনিস নষ্ট করব না,
অপচয় করব না, যথাযথ ব্যবহার করব।
ব্যক্তিগত ও জাতীয় সম্পদ রক্ষা করব
আল্লাহর হুকুম মেনে চলব।

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা অপচয়মূলক কাজের একটি তালিকা তৈরি করবে।

পরনিন্দা না করা (تَرْكُ الْغِيْبَةِ)

পরনিন্দা করা অর্থ গিবত করা, পরচর্চা করা বা কারো দুর্নাম রটানো। কারও অনুপস্থিতিতে তার দোষের কথা বলার নাম গিবত বা পরনিন্দা।

যে পরনিন্দা করে তাকে পরনিন্দুক বলে। পরনিন্দা করা হারাম। মহান আল্লাহ পরনিন্দা করতে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, " তোমরা একে অপরের দোষ খুঁজে বেড়াবে না।"

আল্লাহ তায়ালা পরনিন্দা করাকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। কোনো ভাই তার মৃত ভাইয়ের গোশত কখনো খেতে পারে না। কোনো মুসলমান তেমনি পরনিন্দা করতে পারে না।

পরনিন্দুক মহাপাপী। সে সমাজে শান্তি নষ্ট করে। আল্লাহ তাকে ঘৃণা করেন, ভালোবাসেন না। যে ব্যক্তি পরনিন্দা বা গিবত করে সে জান্নাতে যেতে পারবে না।

মহানবি (স) বলেন, "পরনিন্দাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

পরনিন্দা না করা সুন্দর চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ। পরনিন্দার কারণে সমাজে শত্রুতা সৃষ্টি হয়। শত্রুতা ছড়িয়ে পড়ে। ফলে স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা, সম্মান ও শ্রদ্ধা লোপ পায়। শান্তি নষ্ট হয়।

আমরা পরনিন্দা বা গিবত করব না। কারও কুৎসা রটাব না। কারও দুর্নাম করব না। অপবাদ দেব না। পরনিন্দা থেকে বিরত থাকব। তাহলে আমাদের মাঝে অশান্তি থাকবে না। আমাদের মাঝে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। একটি সুন্দর সুখী সমাজ গড়ে উঠবে। আল্লাহ খুশি হবেন। দুনিয়াতে আল্লাহর রহমত লাভ করব। পরকালে জান্নাতের অনন্ত সুখ-শান্তি ভোগ করব।

আমরা–

পরনিন্দা করব না, পরনিন্দা শুনব না।
সুন্দর জীবন গড়ব, সুন্দর সমাজ গড়ব।

অনুশীলনী

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১) সুন্দর স্বভাব ও ভালো চরিত্রকে আরবিতে কী বলে?

ক. মুনাজাত খ. আখলাক
গ. ইবাদত ঘ. সালাত

২) সচ্চরিত্র কোনটি?

ক. পরনিন্দা করা খ. লোভ করা
গ. মিথ্যা বলা ঘ. সত্য কথা বলা

৩) সত্যিকার মুমিনের চরিত্র কেমন?

ক. সুন্দর খ. অসুন্দর
গ. মিথ্যুক ঘ. অসৎ

৪) অসৎ চরিত্রের কাজ কোনটি?

ক. রোগীর সেবা করা খ. শিক্ষককে সম্মান না করা
গ. ইবাদত করা ঘ. শিক্ষককে সম্মান করা

৫) মহানবি (স) সকলের সাথে কেমন ব্যবহার করতেন?

ক. মন্দ ব্যবহার খ. খারাপ ব্যবহার
গ. ভালো ব্যবহার ঘ. অসৎ ব্যবহার

৬) যে সত্য কথা বলে তাকে কী বলা হয়?

ক. সততা খ. সৎ

গ. সত্যবাদী ঘ. সত্যবাদিতা

৭) মিথ্যা মানুষকে কী করে?

ক. উপকার করে খ. ধ্বংস করে

গ. খাবার দেয় ঘ. সাহায্য করে

৮) যে ওয়াদা পালন করে, সকলে তাকে কী করে?

ক. অসম্মান করে খ. ঘৃণা করে

গ. অবিশ্বাস করে ঘ. বিশ্বাস করে

৯) "যত পায় আরও চায়"–এর নাম কী?

ক. লোভ খ. অপচয়

গ. শান্তি ঘ. ভালোবাসা

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. মন্দ স্বভাব ও খারাপ চরিত্রকে .... চরিত্র বলা হয়।

২. মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের .... ।

৩. যাঁরা বয়সে .... আমরা তাঁদের সালাম দেব।

৪. লোভ আমাদের অনেক .... করে।

৫. আমরা কোনো কিছু .... করব না।

গ. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
চরিত্র ভালো হলে	চলতে শেখান
আব্বা–আম্মার সাথে সুন্দর	ফেলব না
শিক্ষক সৎ ও ন্যায়ের পথে	জীবন সুন্দর হয়
যেখানে সেখানে ময়লা–আবর্জনা	তার ধর্ম নেই
যে ওয়াদা পালন করে না	ব্যবহার কর

২০২১

সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১. আমাদের মহানবি (স)–এর পিতার নাম কী?
২. মহানবি (স) বড়দের সাথে কেমন ব্যবহার করতেন?
৩. মহানবি (স) ছোটদের কী করতেন?
৪. আমরা কাজের লোকদের সাথে কেমন ব্যবহার করব?
৫. প্রতিবেশীর ঘরে খাবার না থাকলে আমরা কী করব?
৬. ওয়াদা পালন করা মানে কী?
৭. কারও অনুপস্থিতিতে তার দোষের কথা বলার নাম কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. সচ্চরিত্র কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
২. বড়দের সাথে আমাদের কেমন ব্যবহার করা উচিত?
৩. প্রতিবেশী কারা? আমরা প্রতিবেশীর সাথে কীরূপ ব্যবহার করব?
৪. ওয়াদা পালন করার উপকারিতা কী?
৫. লোভ মানুষের কী কী ক্ষতি করে?
৬. অপচয় থেকে বিরত থাকার জন্য আমরা কী করব?
৭. আল্লাহ পরনিন্দা না করার জন্য কী বলেছেন?

চতুর্থ অধ্যায়

কুরআন মজিদ শিক্ষা

কুরআন মজিদ আল্লাহর কালাম বা বাণী। সর্বশেষ আসমানি কিতাব। মহানবির (স) এর উপর নাজিল হয় এ কিতাব।

আমরা দুনিয়াতে কীভাবে শান্তিতে বসবাস করব, কী কাজ করলে আখিরাতে শান্তি পাব, কীভাবে আল্লাহর ইবাদত করব, কোন কাজ অন্যায়, কোন কাজে শাস্তি হবে, এ সবকিছু কুরআন মজিদে বর্ণিত আছে।

আমরা কুরআন মজিদ শুদ্ধ করে শিখব। অপরকে শিখাব। কুরআন মজিদের নির্দেশমতো চলব।

সালাতে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করা ফরজ। তাই তিলাওয়াত শুদ্ধ হওয়া দরকার। মহানবি (স) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিখে এবং অপরকে শিখায়।"

কুরআন মজিদ

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা কুরআন মজিদ শিক্ষা সম্বন্ধে মহানবি (স)-এর বাণীটি খাতায় সুন্দর করে লিখবে।

আরবি বর্ণমালা

কুরআন মজিদের ভাষা আরবি। আরবি পড়তে হয় ডান দিক থেকে। আরবিতে মোট ২৯টি হরফ বা বর্ণ আছে।

ج জিম	ث ছা	ت তা	ب বা	ا আলিফ
ر র	ذ যাল	د দাল	خ খ	ح হা
ض দ্বদ	ص ছ্বদ	ش শিন	س সিন	ز ঝা
ف ফা	غ গাইন	ع আইন	ظ জ্ব	ط ত্ব
ن নুন	م মীম	ل লাম	ك কাফ	ق ক্বাফ
	ي ইয়া	ء হামযা	ه হা	و ওয়াও

আরবি হরফগুলোর নাম বলো :

ب	ش	د	ج	ا
ذ	ض	ز	خ	م
ي	ت	ن	س	ر
ط	ص	ل	ف	ث
ك	ء	ق	ظ	ع
	ه	غ	ح	و

খালি ঘরগুলোতে আরবি হরফ বসাও

	ث			ا
ر			خ	
ض		ش		
	غ		ظ	
ن		ل		ق
	ي		ه	

হরকত

আমরা জানি যবর ـَ যের ـِ এবং পেশ ـُ –কে হরকত বলে। যেমন :

১। হরফের উপর যবর থাকলে উচ্চারণে া–কার হবে। যথা :

أَ = আলিফ যবর আ

بَ = বা যবর বা

تَ = তা যবর তা

আমরা এখন যবরসহ নিচের শব্দগুলো পড়ব। যথা :

نَصَرَ = নুন যবর না, সোয়াদ যবর সা, রা যবর রা = নাসারা

دَخَلَ	كَتَبَ	فَتَحَ	خَلَقَ	نَصَرَ
وَلَدَ	طَلَعَ	ذَكَرَ	طَلَبَ	فَعَلَ

২। হরফের নিচে যের থাকলে উচ্চারণে ি – কার হবে। যথা :

بِ = বা যের বি

تِ = তা যের তি

ثِ = সা যের সি

আমরা এখন যের সহ নিচের শব্দগুলো পড়ব। যথা:

لِمَا = লাম যের লি, মীম আলিফ যবর মা = লিমা

لِمَاذَا	بِمَا	هِيَ	اِلٰى	اِذَا
شَهِدَ	سَمِعَ	عَلِمَ	رَحِمَ	سَلِمَ

২০২৫

৩। হরফের উপর পেশ থাকলে উচ্চারণে ু – কার হবে। যথা :

بُ = বা পেশ বু

تُ = তা পেশ তু

ثُ = সা পেশ সু

আমরা এখন পেশসহ নিচের শব্দগুলো পড়ব। যথা :

كُتِبَ = কাফ পেশ কু , তা যের তি, বা যবর বা = কুতিবা

هُوَ	هُمَا	كُمَا	كُمْ	هُمْ
خُلِقَ	جُمِعَ	نُصِرَ	نُصِبَ	كُتِبَ
كَرُمَ	بَعُدَ	قَرُبَ	حَسُنَ	كَثُرَ

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা হরকতযুক্ত আরবি বর্ণগুলো খাতায় সুন্দর করে লিখবে।

তানবীন

দুই যবর ـً, দুই যের ـٍ ও দুই পেশ ـٌ -কে তানবীন বলে।

তানবীনের উচ্চারণ নুনযুক্ত হয়।

এবার আমরা তানবীনসহ চার্টটি পড়ব। যথা :

جً	ثً	تً	بً	اً
رً	ذً	دً	خً	حً
ضً	صً	شً	سً	زً

فً	غً	عً	ظً	طً
نً	مً	لً	كً	قً
	يً	ءً	هً	وً

جٍ	ثٍ	تٍ	بٍ	اٍ
رٍ	ذٍ	دٍ	خٍ	حٍ
ضٍ	صٍ	شٍ	سٍ	زٍ
فٍ	غٍ	عٍ	ظٍ	طٍ
نٍ	مٍ	لٍ	كٍ	قٍ
	يٍ	ءٍ	هٍ	وٍ

جُّ	ثُّ	تُّ	بُّ	أُّ
رُّ	ذُّ	دُّ	خُّ	حُّ
ضُّ	صُّ	شُّ	سُّ	زُّ
فُّ	غُّ	عُّ	ظُّ	طُّ
نُّ	مُّ	لُّ	كُّ	قُّ
	يُّ	ءُّ	هُّ	وُّ

জযম

আমরা জানি জযম ^ যুক্ত হরফকে সাকিন বলে। যথা :

اَلْ = আলিফ লাম যবর আল।

فِيْ = ফা ইয়া যের ফী ।

قُلْ = ক্বাফ লাম পেশ ক্বুল ।

জযম–এর আকৃতি সাধারণত ْ এরূপ হয়। তবে ٛ এভাবেও লেখা হয়।
এবার আমরা জযমযুক্ত হরফের চার্টটি পড়ব :

قُمْ	فِيْ	مِنْ	كُنْ	قُلْ
فَتْحٌ	فِيْلٌ	نَصْرٌ	حَمْدٌ	قَلْبٌ

এবার খালি হরফে জযম বসাও :

حَمدٌ	قَولٌ	حَرفٌ	فِعلٌ	اِسمٌ

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা জযমযুক্ত আরবি কয়েকটি শব্দ খাতায় সুন্দর করে লিখবে।

তাশদীদ

একই হরফ পাশাপাশি দুবার উচ্চারণ করাকে তাশদীদ বলে। তাশদীদের চিহ্ন ـّـ এরূপ। যেমন :

اَنْ + نَ = اَنَّ = আলিফ নুন যবর আন, নুন যবর না = আন্না

رَبْ + بَ = رَبَّ = রা বা যবর রাব, বা যবর বা = রাব্বা

এবার আমরা তাশদীদসহ চার্টটি পড়ব:

رُبَّ	ثُمَّ	مَسَّ	حَقَّ	اَنَّ
رُبْ + بَ	ثُمْ + مَ	مَسْ + سَ	حَقْ + قَ	اَنْ + نَ

এবার এগুলো দেখ এবং খালি হরফে হরকতসহ তাশদীদ বসাও :

ثم + م	حق + ق	ان + ن	اب + ب	رب + ب
ثم	حق	ان	اب	رب

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা তাশদীদযুক্ত পাঁচটি শব্দ খাতায় সুন্দর করে লিখবে।

মাদ্দ

কুরআন মজিদের কোনো কোনো হরফ টেনে পড়তে হয়। এই টেনে পড়াকে মাদ্দ বলে।

যথা : الٓمٓ حٰمٓ

মাদ্দ–এর হরফ তিনটি। যথা: ا - و - ی

১। যবর–এর পরে ا আলিফ থাকলে একটু টেনে পড়তে হয়। যথা :

مَاذَا = মা–যা

قَالَ = কা–লা,

২। যের–এর পরে জযমযুক্ত ی ইয়া থাকলে একটু টেনে পড়তে হয়। যথা :

قِيْلَ = কী–লা.

فِيْهَا = ফী–হা,

৩। পেশ–এর পরে জযমযুক্ত و ওয়াও থাকলে একটু টেনে পড়তে হয়। যথা :

قُوْلُوْا = কু–লু,

صُوْمُوْا = সু–মু,

আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাদ্দ–এর জন্য দুটি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যথা :

১। ছোট মাদ্দ = ~

২। বড় মাদ্দ = ٓ

যে হরফের উপর ~ এরূপ চিহ্ন থাকে সে হরফটিকে একটু টেনে পড়তে হয়। যথা:

بِمَآ ۔ وَمَآ ۔ الَّذِیٓ ۔ لَآ اَعْبُدُ

যে হরফের উপর ٓ এরূপ চিহ্ন থাকে সে হরফটিকে আরও বেশি টেনে পড়তে হয়।

যথা: نٓ ۔ صٓ ، عٓسٓقٓ ، اُولٰٓئِكَ ، ضَآلِّيْنَ ۔

মাদ্দ–এর আরও কিছু চিহ্ন আছে। যেমন :

১। খাড়া যবর ـٰ

কোনো হরফের উপর ـٰ এরূপ চিহ্ন থাকলে সে হরফটিকে একটু টেনে পড়তে হয়।

যথা: طٰهٰ = তোয়া খাড়া যবর তোয়া, হা খাড়া যবর হা = তোয়া–হা

এবার খাড়া যবরযুক্ত কয়েকটি শব্দ পড়ব।

اٰمَنَ۔ ذٰلِكَ۔ عَلٰى۔ بَلٰى۔ اٰدَمَ۔

২। খাড়া যের ـٖ

কোনো হরফের নিচে ـٖ এরূপ চিহ্ন থাকলে সে হরফটিকে একটু টেনে পড়তে হয়।

যথা: بِهٖ = বা যের বি, হা খাড়া যের হী = বিহী

এবার খাড়া যেরযুক্ত কয়েকটি শব্দ পড়ব:

اَمْرِهٖ ، خَيْرِهٖ ، فَضْلِهٖ ، صِفَاتِهٖ ، اَهْلِهٖ ،

৩। উল্টা পেশ ـٗ

আমরা জানি পেশ ـُ এরূপ। তবে উল্টা পেশ লেখা হয় ـٗ এভাবে।

কোনো হরফে উল্টা পেশ থাকলে সে হরফটি একটু টেনে পড়তে হয়। যথা:

لَهٗ = লাম যবর লা, হা উল্টা পেশ হু = লাহু।

এবার উল্টা পেশযুক্ত কয়েকটি শব্দ পড়ব:

اِنَّهٗ ۔ مَعَهٗ ۔ نَفْسَهٗ ۔ رَسُوْلُهٗ ۔ رَحْمَتُهٗ

নিচের শব্দগুলো পড়ি:

۔ قٓ ۔ كُتُبِهٖ ۔ لَا ۔ مَعَهٗ۔

তাজবীদ (تَجْوِيْدٌ)

কুরআন মজিদের ভাষা আরবি। তাই আমাদেরকে আরবি ভাষা শিখতে হবে। আমরা আরবি হরফের সঠিক উচ্চারণ শিখব। সঠিক উচ্চারণে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করা প্রয়োজন। এতে অর্থ ঠিক থাকে। সালাত শুদ্ধ হয়। আল্লাহ পাক খুশি হন। আর সঠিক উচ্চারণে তিলাওয়াত না করলে অর্থ ঠিক থাকে না। সালাতও শুদ্ধ হয় না।

কুরআন মজিদ শুদ্ধভাবে তিলাওয়াতের জন্য যে নিয়ম রয়েছে তাকে তাজবীদ বলে।

মহানবি (স) বলেছেন, "কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করলে প্রত্যেক হরফের জন্য ১০টি সাওয়াব পাওয়া যায়।"

মাখরাজ (مَخْرَجٌ)

আরবি হরফ বাগযন্ত্রের বিভিন্ন স্থান থেকে উচ্চারিত হয়। যেমন, কণ্ঠনালি, জিহ্বা, তালু, দাঁত ও ঠোঁট।

হরফ উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলা হয়। আরবি হরফের মাখরাজ ১৭টি। এ সম্পর্কে আমরা বড় হলে জানতে পারব।

ইদগাম (اِدْغَامٌ)

কাছাকাছি উচ্চারণের দুটি হরফকে যুক্ত করে পড়াকে ইদগাম বলে। যথা:

فَهُمْ مُسْلِمُوْنَ = ফাহুম মুসলিমুন। এখানে মিম م হরফটি পরবর্তী মিম-এর সাথে ইদগাম হয়েছে।

مِنْ رَّبِّ = মির রাব্বি। এখানে নুন ن হরফটি পরবর্তী রা ر-এর সাথে ইদগাম হয়েছে।

مِنْ مِّثْلِهٖ = মিম মিসলিহী। এখানে নুন হরফটি পরবর্তী মিম-এর সাথে ইদগাম হয়েছে।

আমরা এখন নিচে শব্দগুলো ইদগামসহ পড়ব।

غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ গাফূর্রুর রাহীম	مِنْ مَّرْقَدِنَا মিম মারকাদীনা	مَنْ يَّقُوْلُ মাইয়াকূলু
وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহূ	اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ইন কুনতুম মু'মিনীন	مِنْ رِّزْقٍ মির্‌রিয্‌কিন

ইযহার – اِظْهَارٌ

ইযহার শব্দের অর্থ প্রকাশ করা। বর্ণে বা হরফের মাখরাজ অনুযায়ী স্পষ্ট করে উচ্চারণ করা। নূন সাকিন এবং তানবীন-এর পর যদি হরফে হালকির যেকোনো একটি হরফ থাকে তখন নূন সাকিন বা তানবীনকে গুন্নাহ ও ইখফা ছাড়া নিজ মাখরাজ অনুসারে স্পষ্ট করে পড়াকে ইযহার বলে।

হরফে হালকি ৬টি। যথা : ء - ه - ح - خ - ع - غ

مِنْ خَوْفٍ - عَذَابٌ اَلِيْمٌ - مَنْ هُوَ - مِنْ عَلَقٍ - عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ - عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ -

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা ইযহারের উচ্চারণের একটি চার্ট তৈরি করবে।

আরবি বর্ণের শব্দ

নিচে ৪টি চার্ট দেয়া হলো। এগুলো সঠিক উচ্চারণে পড় :

চার্ট ১

مَلِكَ	خَلَقَ	كَادَ	قَادَ	كَصَدَ	قَصَدَ
نَسْرٌ	نَصْرٌ	فَلَقٌ	فَلَكٌ	حَرْبٌ	هَرْبٌ

চার্ট–২

চার বর্ণের শব্দ

سَرِيْرٌ	شَرِيْرٌ	اَلِيْمٌ	عَلِيْمٌ	بَصِيْرٌ	بَشِيْرٌ
اَكْبَرٌ	اَقْرَبٌ	صُوْرَةٌ	سُوْرَةٌ	زَمِيْلٌ	جَمِيْلٌ

চার্ট–৩

পাঁচ বর্ণের শব্দ

تَصْفِيْرٌ	تَصْوِيْرٌ	تَكْرِيْرٌ	تَقْرِيْرٌ	مَشْكُوْرٌ	مَذْكُوْرٌ
اَشْفِيْرٌ	تَشْرِيْبٌ	تَكْرِيْمٌ	تَقْدِيْمٌ	تَحْرِيْمٌ	تَكْبِيْرٌ

চার্ট–৪

ছয় বর্ণের শব্দ

يَاْكُلُوْنَ	يَقُوْلُوْنَ	يَذْكُرُوْنَ	يَشْكُرُوْنَ	مُفْلِحُوْنَ	مُسْلِمُوْنَ
مُكَالَمَةٌ	مُقَاتَلَةٌ	مُجْرِمُوْنَ	مُحْسِنُوْنَ	يَنْظُرُوْنَ	يَنْصُرُوْنَ

সূরা আন নাসর

মাদানি, আয়াত– ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا ۝
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝

বাংলা উচ্চারণ

ইযা জাআ নাসরুল্লাহি ওয়ালফাতহু। ওয়ারাআইতান নাসা ইয়াদখুলূনা ফী দীনিল্লাহি আফওয়াজা। ফাসাব্বিহ বিহামদি রাব্বিকা ওয়াসতাগফিরহু। ইন্নাহু কানা তাওওয়াবা।

অর্থ : ১. যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে।

২. এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবে।

৩. তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা কর, তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি তো তওবা কবুলকারী।

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা সূরা আন নাসর বাংলা উচ্চারণে লিখবে।

সূরা আল লাহাব

মাক্কি, আয়াত– ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

تَبَّتْ يَدَآ أَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۗ مَآ أَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۗ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ
لَهَبٍ ۚ وَّامْرَأَتُهٗ ۗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۚ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۚ

বাংলা উচ্চারণ

তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবিঁও ওয়াতাব্বা। মা আগনা আনহু মালুহু ওমাকাসাব। সাইয়াসলা নারান যাতা লাহাবিঁও ওয়ামরাতুহু, হাম্মালাতাল হাতাব। ফী জীদিহা হাবলুম মিম মাসাদ।

অর্থ : ১. ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও।

২. এর ধন–সম্পদ ও এর উপার্জন তার কোনো কাজে আসেনি।

৩. অচিরেই সে দগ্ধ হবে লেলিহান অগ্নিতে,

৪. এবং তার স্ত্রীও যে ইন্ধন বহন করে,

৫. তার গলদেশে পাকানো রজ্জু।

সূরা ইখলাস

মাক্কি, আয়াত–৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۵ۙ
وَلَمْ يُوْلَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

বাংলা উচ্চারণ

কুল হুয়াল্লাহু আহাদ। আল্লাহুস সামাদ। লাম ইয়ালিদ; ওয়া লাম ইউলাদ। ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুয়ান আহাদ।

অর্থ : ১. বলো, তিনি আল্লাহ, একক।

২. আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন।

৩. তার কোনো সন্তান নাই এবং তিনি কারও সন্তান নন।

৪. এবং তার সমতুল্য কেউ নাই।

অনুশীলনী

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

ক. বহু নির্বাচনি:

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. কুরআন মজিদ কার কালাম?

ক) মহানবি (স)–এর কালাম
খ) আল্লাহ্ তায়ালার কালাম
গ) ফেরেশতার কালাম
ঘ) মানুষের কালাম

২. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উপর কোন কিতাব নাজিল হয়েছিল?

ক) ইনজিল
খ) তাওরাত
গ) যাবুর
ঘ) কুরআন মজিদ

৩. মাদ্দ–এর হরফ কয়টি?

ক) তিনটি
খ) চারটি
গ) পাঁচটি
ঘ) ছয়টি

৪. হরফে হালকি কয়টি?

ক) পাঁচটি
খ) ছয়টি
গ) সাতটি
ঘ) আটটি

৫. ইদগাম–এর হরফ কয়টি?

ক) তিনটি
খ) চারটি
গ) পাঁচটি
ঘ) ছয়টি

৬. আরবি হরফের মাখরাজ কয়টি?

ক) ১১টি
খ) ১৩টি
গ) ১৭টি
ঘ) ১৯টি

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর

১. কুরআন মজিদ .... কালাম।

২. হরফ উচ্চারণের স্থানকে .... বলে।

৩. কুরআন মজিদের .... আরবি।

গ. বাম দিকের শব্দের সাথে ডান দিকের চিহ্নের মিল কর :

১. যবর	ـٌ
২. যের	ـً
৩. পেশ	ـَ
৪. জযম	ـّ
৫. তাশদীদ	ـِ
৬. তানবীন	ـُ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. আরবি হরফ কয়টি?
২. হরকত কয়টি?
৩. মাদ্দের হরফ কয়টি?
৪. হরফে হালকি কয়টি?
৫. সাকিন কাকে বলে?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. কুরআন মজিদ তিলাওয়াত সম্পর্কে মহানবি (স)-এর বাণীটি লেখ।
২. হরকত কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
৩. তানবীন কাকে বলে? একটি করে উদাহরণ দাও।
৪. মাদ্দ কাকে বলে? মাদ্দ-এর হরফ কয়টি? উদাহরণ দাও।
৫. তাজবীদ কাকে বলে?
৬. মাখরাজ কাকে বলে? মাখরাজ কয়টি?
৭. ইদগাম কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
৮. সূরা ইখলাস মুখস্থ বলো।

পঞ্চম অধ্যায়

নবি ও রাসুলগণের পরিচয় ও জীবনাদর্শ

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের খুব ভালোবাসেন। তাঁর ইচ্ছায় আমরা সুন্দর জীবন গড়ে তুলব। তাহলে দুনিয়াতে সুখ-শান্তি পাব। আখিরাতে জান্নাত লাভ করব। জান্নাতে রয়েছে অফুরন্ত সুখ ও শান্তি।

কীভাবে আমরা সুন্দর জীবন গড়ে তুলব। কোন পথে চললে আল্লাহ খুশি হবেন? কী কাজ করলে দুনিয়াতে সুখে বসবাস করব ও শান্তিতে থাকব? এসবের সন্ধান পেয়েছি আমরা নবি–রাসুলগণের মাধ্যমে। তাঁরা আমাদের শিক্ষক। তাঁরা আমাদের আল্লাহর ইবাদত করার নিয়মকানুন শিখিয়েছেন। সঠিক পথে জীবনযাপন করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা অনেক নবি–রাসুল পাঠিয়েছেন। কুরআন মজিদে ২৫ জন নবি–রাসুলের নাম উল্লেখ আছে। এদের মধ্যে হযরত আদম আলাইহিস সালাম পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানুষ এবং প্রথম নবি। আর আমাদের মহানবি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি। এখন আমরা কয়েকজন নবি–রাসুলের জীবনাদর্শ জানব।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনাদর্শ

জন্ম ও পরিচয়

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা নগরীতে কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ। মাতার নাম আমিনা। দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর নাম রাখেন মুহাম্মদ (প্রশংসিত)। আর মা আমিনা তাঁর নাম রাখেন আহমাদ (প্রশংসাকারী)।

মহানবি(স) এর জন্মের আগেই তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন। আর তাঁর ছয় বছর বয়সে মা-ও ইন্তিকাল করেন। বাবা–মা হারা ইয়াতীম মুহাম্মদ (স)-কে তখন থেকে লালন-পালন করতে থাকেন তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব। দাদার ইন্তিকালের পর চাচা আবু তালিব তাঁর লালন–পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আবু তালিব মহানবি (স)-কে খুব আদর–স্নেহ করতেন।

মহানবি (স)-এর চরিত্র ছিল খুবই সুন্দর। শিশুকাল থেকেই তিনি সবসময় সত্য কথা বলতেন। মানুষের উপকার করতেন। বড়দের সম্মান করতেন। ছোটদের আদর করতেন। কখনো মিথ্যা কথা বলতেন না। কাউকে গালি দিতেন না। কারও সাথে ঝগড়া করতেন না।

মারামারি করতেন না। হিংসা করতেন না। সকলের সাথে মিলেমিশে থাকতেন।

সবাই তাঁকে ভালোবাসত। আদর করত। সম্মান করত। বিশ্বাস করত। আল-আমিন বলে ডাকত। আল-আমিন অর্থ বিশ্বাসী। মহানবি (স) এর মতো আমরা –

সত্যকথা বলব, মানুষের উপকার করব,
বড়দের সম্মান করব, ছোটদের আদর করব,
সকলকে ভালোবাসব, বিশ্বাস করব,
তাহলে মহানবি (স) আমাদের ভালোবাসবেন, আল্লাহ ভালোবাসবেন।

হিলফুল ফুজুল গঠন

মহানবি (স) ছোটবেলা থেকেই অপরের অধিকার সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। শিশু অবস্থায়ই তিনি অন্যের অধিকার সংরক্ষণ করেছেন। তাঁর সমবয়সী দুধমা হালিমার একটি পুত্র সন্তান ছিল। তিনি তাঁর দুধমার একটি স্তনের দুধ নিজে পান করতেন এবং অন্য স্তনের দুধ তাঁর দুধ ভাইয়ের জন্য রেখে দিতেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি অপরের দুঃখে দুঃখ পেতেন। অন্যের কষ্টে কষ্ট পেতেন, অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হতেন।

তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেন। কারও কোনো অসুবিধা হলে তা দূর করার চেষ্টা করতেন। অসহায় ও নিপীড়িত মানুষকে সাহায্য করতেন। সাধ্যমতো মানুষের সেবা করতেন।

জুয়াখেলা মারাত্মক অপরাধ। এতে সুসম্পর্ক নষ্ট হয়। শত্রুতা বাড়ে। অনেক কলহ ও মারামারি হয়। যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে। একদা আরবদেশে ওকায মেলায় জুয়াখেলাকে কেন্দ্র করে কুরাইশ ও কায়েস বংশের মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধ দীর্ঘ পাঁচ বছর স্থায়ী ছিল। অনেক লোক এ যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করে। মহানবি (স) নিজে তাঁর চাচা যুবায়ের (রা)-এর সাথে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি শত্রুদের নিক্ষিপ্ত তীরগুলো সংগ্রহ করে চাচার হাতে তুলে দিতেন। এটি 'হারবুল ফিজার' (حَرْبُ الْفِجَارِ) বা 'অন্যায় সমর' নামে পরিচিত। এ ভয়াবহ যুদ্ধের দৃশ্য দেখে মহানবি (স)-এর প্রাণ কেঁদে উঠল। তিনি চিন্তা করলেন, কীভাবে দেশের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা যায়? কীভাবে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখা যায়? অসহায়দের সাহায্য করা যায়? এজন্য তিনি কয়েকজন উৎসাহী যুবককে সাথে নিয়ে একটি সেবাসংঘ গঠন করেন। আর এই সংঘের নাম রাখেন

হিলফুল ফুজুল (حِلْفُ الْفُضُوْلِ) বা শান্তিসংঘ। এই সংঘের মাধ্যমে তিনি দুঃখী ও অসহায় মানুষদের দুঃখ–কষ্ট দূর করার চেষ্টা করেন। সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরে আসে। তখন মহানবি (স) এর বয়স ছিল মাত্র ১৫ বছর। এ সংঘ প্রায় ৫০ বছর স্থায়ী ছিল।

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা 'হিলফুল ফুজুল' –এর নীতিগুলো খাতায় লিখবে।

নবুয়ত লাভ

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) সমাজের দুরবস্থা দেখে দুঃখ পেতেন। কষ্ট পেতেন। মানুষের নৈতিক অধঃপতন তাঁকে বিশেষভাবে চিন্তিত করে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাঁর চিন্তাভাবনাও বাড়তে থাকে। তিনি মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে 'হেরা' নামক পর্বতের নির্জন গুহায় আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। তাঁর মনে নানা চিন্তা ও প্রশ্ন জাগত।

তিনি ভাবতেন আমি কে? কোথা থেকে এসেছি? কেন এসেছি? আবার কোথায় যাব?

হেরাগুহা: আমাদের প্রিয় নবি (স) এই গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন।

এই পৃথিবী সৃষ্টির কী উদ্দেশ্য? মানুষ এত হানাহানি কেন করে ইত্যাদি।

এভাবে মহানবি (স)-এর ধ্যান ও ইবাদত চলতে থাকল। তাঁর বয়স ৪০ বছর হলো। রামাযান মাসের কদর রাত। মহানবি (স) হেরাগুহায় ধ্যানরত। চারদিক নীরব, নিঝুম। এমন সময় আঁধার গুহা আলোকিত হয়ে উঠল। আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতা জিবরাইল (আ) আল্লাহর মহান বাণী সর্বপ্রথম নিয়ে আসলেন। তিনি মহানবি (স)-কে লক্ষ্য করে বললেন, اِقْرَأْ (ইক্বরা-পড়ুন)। পড়তে বললেন, কুরআন মজিদের সূরা আলাকের প্রথম ৫টি আয়াত।

সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াতের অর্থ:

ক) (হে মুহাম্মদ!) পাঠ কর, তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।

খ) যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত (আলাক) থেকে।

গ) পাঠ কর, আর তোমার রব মহিমান্বিত।

ঘ) যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে।

ঙ) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।

এভাবে তিনি ৪০ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করলেন।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াতের অর্থ খাতায় লিখবে।

মক্কায় ইসলাম প্রচার

মহানবি (স) নবুয়ত লাভের পর আল্লাহর তাওহিদ (একত্ববাদ) প্রচার করতে থাকলেন। তাওহিদ অর্থ একত্ববাদ। তিনি প্রথম তিন বছর আত্মীয়-স্বজন ও নিকটতম লোকদের কাছে গোপনে ইসলাম প্রচার করেন। তাঁর স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর পুরুষদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা) এবং বালকদের মধ্যে হযরত আলী (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রথম তিন বছরে ৪৫ জন নরনারী ইসলাম গ্রহণ করেন।

অতঃপর তিনি আল্লাহর নির্দেশে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। অনেকেই ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিতে থাকলেন। কিন্তু কুরাইশ বংশের অনেক নেতা তাঁর কথা মানল না। তারা মহানবি (স)-এর ঘোর শত্রু হলো। মহানবি (স)-এর উপর রেগে গেল। তাঁর উপর অত্যাচার শুরু করল। তাঁর চাচা আবু লাহাব তাঁকে পাথর ছুঁড়ে মারল। রক্তাক্ত করল।

কেউ কেউ তাঁকে পাগল বলতে লাগল। তাঁর উপর শারীরিক নির্যাতন শুরু হলো। তাঁর মাথার উপর ময়লা–আবর্জনা ফেলল। চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে দিল। তাঁর অনুসারীদের উপর নির্মম অত্যাচার শুরু করল। এভাবে তারা মহানবি (স) ও তাঁর অনুসারীদেরকে ইসলাম প্রচারে বাধা দিতে থাকল।

মহানবির (স) আল্লাহর উপর অটল বিশ্বাস ছিল। ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে তিনি সব অত্যাচার সহ্য করলেন। সকল বাধা অতিক্রম করে তিনি ইসলাম প্রচার করলেন।

পরিকল্পিত কাজ : মক্কায় ইসলাম প্রচারে মহানবি (স) যেসব বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন শিক্ষার্থীরা তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

শ্রমের মর্যাদা দান

শ্রম মানে কাজ করা, পরিশ্রম করা। আমাদের মহানবি (স) সবসময় নিজের কাজ নিজেই করতেন। তিনি কখনো কাজ ফেলে রাখতেন না। কাজে অবহেলা করতেন না। নিজে কাজ করতেন। অপরকে সাহায্য–সহযোগিতা করতেন।

আমরা অনেক সময় হাতে কাজ করতে গেলে লজ্জা পাই। মনে করি যে, হাতে কাজ করলে লোকে আমাকে কাজের লোক বলবে। চাকর বলবে। ঘৃণা করবে। অসম্মান করবে। কিন্তু এ রকম মনে করা ঠিক না। বরং যে কাজ করে তাকে সবাই ভালোবাসে। শ্রদ্ধা করে। স্নেহ করে। আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। মর্যাদা দান করেন।

মহানবি (স) ছেঁড়া জামাকাপড় নিজহাতে সেলাই করতেন। জুতা মেরামত করতেন। জামা-কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার করতেন। ঘর ঝাড়ু দিতেন। মেহমানকে নিজে খাওয়াতেন। সেবাযত্ন করতেন। তিনি পরিবারের অন্যদের সাথে কাজ করতেন। সকলের সাথে মিলেমিশে কাজ করতেন। কাজকে ঘৃণা করতেন না।

একটি ঘটনা: একদিন মহানবি (স) রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। দেখতে পেলেন যে, এক বৃদ্ধ লোক বাগানে পানি দিচ্ছে। পানি ছিল বাগান থেকে অনেক দূরে। বৃদ্ধ লোকটির পানি আনতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। লোকটি ছিল চাকর। মহানবির (স) দয়া হলো। তিনি লোকটির কষ্ট দেখে এগিয়ে গেলেন। বৃদ্ধের হাত থেকে পানির পাত্র নিজের হাতে নিয়ে বাগানে পানি দিলেন। বৃদ্ধ লোকটি মহানবির (স) উপর খুব খুশি হল।

মহানবি (স) চাকরদের সম্পর্কে বলেছেন, "যারা কাজ করে তারা তোমাদের ভাই। তাদের

কষ্ট দেবে না। মর্যাদা দেবে। নিজে যা খাবে তাদের তা খাওয়াবে। নিজে যা পরবে তাদের তা পরাবে। কাজকর্মে তাদের সাহায্য করবে।"

তিনি আরও বলেন, "শ্রমিককে তার গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।"

আমাদের বাসাবাড়িতে গরিব লোকজন ও মহিলারা নানারকম কাজকর্ম করে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও কাজ করে থাকে। আমরা তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করব। কাজের লোকজন বয়সে বড় হলে তাদের সম্মান করব। বয়সে ছোট হলে আদর-স্নেহ করব। নিজেরা যা খাব তাদেরও তাই খেতে দেব। মাত্রাতিরিক্ত কাজ দেব না। তাদের কাজে সাহায্য করব। তাদের কষ্ট দেব না। দুঃখ দেব না। তারা আমাদের মতো মানুষ। তারা আমাদের ভাইবোন আমাদের মতো তাদেরও মর্যাদা আছে। আমরা তাদের মর্যাদা দেব। তাদের শ্রমের মর্যাদা দেব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা মহানবি (স)-এর শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে ৫টি বাক্য লিখবে।

মহানবি (স)-এর দয়া

মহানবি (স) ছিলেন দয়ার উজ্জ্বল আদর্শ। তিনি মানুষ, পশুপাখি ও গাছপালা সকলের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতেন। কেউ ক্ষুধার্ত হলে তাকে খাদ্য দিতেন। অসুস্থ হলে তার খোঁজখবর নিতেন। সেবাযত্ন করতেন। গরিব, ভিক্ষুক, ইয়াতীম ও অসহায়দের প্রতি দয়া দেখাতেন।

একদা মহানবি (স) সাহাবিদের নিয়ে বসে আছেন। এমন সময় এক ইয়াতীম বালক মহানবির (স) কাছে এল। তার গায়ে জামাকাপড় ছিল না। দুঃখকষ্ট সইতে সইতে তার বুকের হাড়গুলো বের হয়ে গেছে। বালকটি কাঁদতে কাঁদতে মহানবিকে (স) বলল, আমার আব্বু নাই। আবু জাহল আমাদের সম্পদ কেড়ে নিয়েছে। তার কাছে সম্পদের কিছু চাইলে সে আমাকে মারধর করে, অত্যাচার করে, তাড়িয়ে দেয়। বালকটির কথা শুনে মহানবির (স) মনে দয়া হলো। তাঁর চোখে পানি এলো। তিনি বালকটিকে নিয়ে আবু জাহলের কাছে গেলেন। বালকটির সব পাওনা আবু জাহলের কাছ থেকে আদায় করে দিলেন। ইয়াতীম বালকটি খুব খুশি হলো।

তিনি শুধু মানুষের প্রতি দয়া দেখাননি, বরং আল্লাহর সকল সৃষ্টির প্রতি দয়া দেখিয়েছেন। যারা আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া দেখায় আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন। তাদের প্রতি খুশি হন।

মহানবি (স) বলেছেন, "পৃথিবীতে যারা আছে তাদের প্রতি দয়া দেখাও, তাহলে আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া দেখাবেন।"

আমরা দয়া দেখাব–

ইয়াতীম, অসহায়দের প্রতি,
পশুপাখি ও গাছপালার প্রতি,
সকল মানুষের প্রতি,
আল্লাহর সকল সৃষ্টির প্রতি।

মহানবি (স)–এর ক্ষমা

মহানবি (স) ছিলেন ক্ষমার মূর্তপ্রতীক। তিনি শত্রু-মিত্র সবাইকে ক্ষমা করতেন। তিনি তাঁর চরম শত্রুকে হাতের মুঠোয় পেয়েও প্রতিশোধ নেন নি। তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

একটি ঘটনা: মহানবি (স) গাতফানের যুদ্ধ শেষ করে বাড়িতে ফিরছেন। এক কাফির তাঁর কাছে এল। সে একটি খোলা তলোয়ার মহানবি (স)–কে দেখিয়ে বলল, "হে মুহাম্মাদ, তোমাকে এই তলোয়ারের আঘাত থেকে কে রক্ষা করবে?" মহানবি (স) নির্ভয়ে উত্তর দিলেন, "আল্লাহ"। কাফির উত্তর শুনে খুবই ভয় পেল। তার হাত থেকে তলোয়ারটি পড়ে গেল। তখন মহানবি (স) ঐ তলোয়ারটি হাতে তুলে নিয়ে তাকে প্রশ্ন করলেন, "ওহে, এখন তোমাকে কে রক্ষা করবে?" কাফির খুব ভয় পেল। মহানবি (স)–এর নিকট ক্ষমা চাইলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

মক্কা বিজয়ের পর মহানবি (স) সকল মক্কাবাসীকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তাঁর ক্ষমার আদর্শে মুগ্ধ হয়ে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা মহানবি (স)-এর ক্ষমা সম্বন্ধে ৫টি বাক্য লিখবে।

মহানবি (স)–এর মাতৃভক্তি

আব্বা–আম্মা আমাদের সবচেয়ে আপনজন। বিশেষ করে আম্মা আমাদের জন্য অনেক কষ্ট করেন। তিনি স্নেহ–মমতা ও দরদ দিয়ে আমাদের লালনপালন করেন। আমাদের কল্যাণ কামনা করেন। এহেন হিতাকাঙ্ক্ষী মায়ের ভক্তি করা একান্ত কর্তব্য।

মহানবির (স) বয়স যখন ৬ বছর তখন তাঁর আম্মা আমিনা ইন্তিকাল করেন। তাই তিনি তাঁর আম্মাকে সেবাযত্ন করার সুযোগ পান নি। কিন্তু তাঁর দুধমা হযরত হালিমা (রা) কে তিনি চরম ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন। সম্মান দিতেন।

একদিনের ঘটনা: আমাদের মহানবি (স) সাহাবিগণের সাথে বসে আছেন। সেখানে এক বৃদ্ধা আসলেন। মহানবি (স) তাঁকে দেখে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বৃদ্ধাকে সম্মান

করলেন। মর্যাদা দিলেন। নিজের গায়ের চাদর বিছিয়ে দিলেন। খুব যত্নের সাথে বসালেন। সাহাবিগণ অবাক হলেন। তাঁরা মহানবিকে (স) জিজ্ঞাসা করলেন, "ইনি কে?" তিনি উত্তরে বললেন, " ইনি আমার দুধমা হালিমা।"

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা মহানবি (স)-এর মাতৃভক্তি ঘটনাটি খাতায় লিখবে ।

হযরত মূসা (আ)

হযরত মূসা (আ) ছিলেন একজন বিখ্যাত নবি। তাঁর পিতার নাম ইমরান। মাতার নাম ইউখাবেজ। তিনি আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ১০৪০ অব্দে মিশরে বনি ইসরাইল বংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাচীনকালে মিশরের বাদশাহকে ফিরআউন বলা হতো। তাদের মধ্যে এক ফিরআউনের নাম ছিল ওলীদ। ওলীদ ছিল খুব লোভী। তার আকাঙ্ক্ষা ছিল নিজেকে উপাস্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা। সে তার মন্ত্রী ও বন্ধু হামানের পরামর্শে রাজ্যের ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দিল। জনগণ ধর্ম ও জ্ঞানচর্চা ভুলে মূর্খে পরিণত হলো। সুযোগ বুঝে সে নিজেকে উপাস্য বলে ঘোষণা করল। কিবতী বংশ তার অনুগত ছিল, তারা তাকে পূজা করতে শুরু করল। কিন্তু বনি ইসরাইল বংশ তখনও হযরত ইউসুফ (আ)-এর একত্ববাদের ধর্ম মেনে চলত। তারা ফিরআউনকে খোদা বলতে সম্মত হলো না। ফিরআউন ও কিবতী বংশ বনি ইসরাইলদের উপর কঠিন নির্যাতন চালাতে লাগল। এরই মধ্যে ওলীদ স্বপ্নে দেখল যে, বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে এক ঝলক আগুন বের হয়ে এসে তার রাজপ্রাসাদসহ সবকিছু গ্রাস করছে। তার অনুসারী কিবতী বংশকেও জ্বালিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু বনি ইসরাইলগণ সম্পূর্ণ নিরাপদ। আগুন তাদের স্পর্শ করছে না। ফিরআউন রাজ্যের গণকদের ডেকে এর ব্যাখ্যা জানতে চাইল। বালআম বাউর নামে এক গণক বলল, "ইসরাইল বংশে একটি ছেলে শিশু জন্মগ্রহণ করবে। সে আপনার ও আপনার রাজত্বের ধ্বংসের কারণ হবে এবং কিবতী বংশ ধ্বংস হবে।" স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে ফিরআউন তার সিংহাসন থেকে লাফিয়ে উঠল। সে রাজ্যময় সৈন্যদের পাহারা নিযুক্ত করল এবং জন্মগ্রহণকারী সকল ইসরাইলি শিশু ছেলেকে হত্যার নির্দেশ দিল। সৈন্যরা গর্ভবতী মহিলাদের তালিকা তৈরি করল। আর নবজাত পুত্রসন্তানদের হত্যা করতে লাগল। এভাবে অসংখ্য ইসরাইলি ছেলেশিশু ফিরআউনের লোকদের হাতে নিহত হলো।

জন্ম

হযরত মূসা (আ)-এর মাতা গর্ভধারণ করেছিলেন। আল্লাহর কুদরতে ফিরআউনের লোকেরা তা বুঝতেই পারেনি। তাঁর জন্ম হলো। ফিরআউনের মা ভয়ে শিশু মূসাকে একটি

সিন্দুকে ভরে আল্লাহর নির্দেশে নদীতে ভাসিয়ে দিলেন। আল্লাহর কুদরতে সিন্দুকটি ভাসতে ভাসতে নদীর তীরবর্তী ফিরআউনের রাজপ্রাসাদের ঘাটে গিয়ে ভিড়ল। ফুটফুটে মায়াভরা চেহারার শিশুটিকে দেখে ফিরআউনের স্ত্রী হযরত আছিয়া কোলে তুলে নিলেন। আছিয়া ছিলেন ইসরাইলি কন্যা। তিনি এক আল্লাহতে বিশ্বাস করতেন। ফিরআউন তাঁকে জোর করে বিয়ে করেছিল। শিশু মূসা (আ) অন্য কারও দুধ পান না করায় হযরত মূসা (আ)-এর বড়বোন মরিয়মের পরামর্শে মূসা (আ)-এর মাকেই ধাত্রী নিয়োগ করা হলো। আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতে মূসা (আ) ফিরআউনের ঘরে, তারই অর্থব্যয়ে মায়ের কোলে লালিত পালিত হতে লাগলেন।

মাদইয়ান বা মাদয়ান গমন

একবার মূসা (আ) দেখতে পেলেন ফিরআউনের কিবতী বংশীয় এক বাবুর্চি এক ইসরাইলি কাঠুরিয়ার প্রতি অত্যাচার করছে। তিনি ইসরাইলিকে বাঁচাবার জন্য কিবতীকে ঘুষি মারলেন। এতে সে মারা গেল। পরের দিনও অনুরূপ ঘটনা ঘটল। আর এক কিবতী আগের দিনের ইসরাইলির উপর অত্যাচার করছিল। মূসা (আ) এগিয়ে গেলে ইসরাইলি ভয় পেয়ে পূর্বদিনের ঘটনা বলে দেয়। কিবতী এসে ফিরআউনকে খবর দিল যে, কিবতীর হত্যাকারী মূসা (আ)। ফিরআউন মূসা (আ)-এর দণ্ড ঘোষণা করল। এ ঘটনা জানতে পেয়ে মূসা (আ) মিশর ছেড়ে লোহিত সাগরের পূর্বতীরে মাদয়ান চলে যান। সেখানে তিনি বিখ্যাত নবি হযরত শুআইব (আ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। হযরত শুআইব (আ) মূসা (আ)-এর খেদমত কর্মদক্ষতা ও চারিত্রিক গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা সফুরাকে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। সেখানে তিনি দশ বছর কাটান। এ সময় তিনি বকরিও চরিয়েছেন।

নবুয়ত লাভ

হযরত মূসা (আ) স্ত্রী সফুরা এবং খাদেম ও মেষ-বকরির পাল নিয়ে মায়ের সাথে দেখা করার জন্য মাদইয়ান থেকে মিশর যাত্রা করলেন। পথে আগুনের খুব প্রয়োজন ছিল। দূর থেকে আলো দেখে তিনি আগুনের খোঁজে তুর পাহাড়ের কাছে গেলেন। তিনি পাহাড়ের পাদদেশে 'তুয়া' নামক পবিত্র উপত্যকায় নবুয়ত লাভ করেন।

আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বললেন, "আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। অতএব যা আদেশ করা হয় তা শুনতে থাক।"– সূরা ত্বাহা: ১৩

এ সময় আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা (আ)-এর সাথে সরাসরি কথা বলেছিলেন। এজন্য তিনি 'কালিমুল্লাহ' উপাধিতে ভূষিত হন।

আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসাকে (আ) ফিরআউনের নিকট গিয়ে দীনের দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। হযরত মূসা (আ) আল্লাহর কাছে তাঁর সীমাবদ্ধতা ও অসুবিধার কথা জানিয়ে দোয়া করলেন। তিনি যেন তাঁকে সাহস দেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর কাজ সহজ করে দেন এবং তার মুখের জড়তা দূর করে দেন। যাতে লোকেরা তাঁর কথা বুঝতে পারে। তিনি তাঁর ভাই হারুন (আ)-কেও সহযোগী হিসেবে চাইলেন আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রার্থনা কবুল করলেন।

হযরত মূসা (আ) তাঁর ভাই হারুন (আ)-কে নিয়ে ফিরআউনের কাছে গিয়ে দীনের দাওয়াত দিলেন। তিনি আল্লাহর দেওয়া অলৌকিক ঘটনাও দেখালেন। কিন্তু ফিরআউন কিছুতেই ইমান আনল না। বরং সে হযরত মূসা (আ)-কে হত্যা করার সংকল্প করল।

দলবলসহ ফিরআউনের ধ্বংস

হযরত মূসা (আ) ফিরআউনের কুমতলব জানতে পেরে ইসরাইলিদের নিয়ে মিশর ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন। সংবাদ পেয়ে ফিরআউন তার সেনাবাহিনী নিয়ে মূসা (আ)-এর পিছু ধাওয়া করল। মূসা (আ) তাঁর অনুসারীদের নিয়ে নীলনদের তীরে উপস্থিত হলেন। সামনে নীলনদ ও পেছনে ফিরআউন বাহিনী। এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার আদেশে হযরত মূসা (আ) হাতের লাঠি দ্বারা নদীতে আঘাত করলেন। পানি দুই ধারে সরে গেল। বনি ইসরাইলের ১২টি দলের জন্য ১২টি রাস্তা হয়ে গেল। হযরত মূসা (আ) তাঁর লোকজনসহ নিরাপদে নদী পার হয়ে গেলেন। ফিরআউন নদীতে শুকনা রাস্তা দেখে সে রাস্তা ধরেই পার হতে লাগল। যেই না তারা নদীর মাঝখানে পৌঁছল, অমনি রাস্তা নদীর পানিতে মিলিয়ে গেল। ফিরআউন তার দলবলসহ ডুবে মরল। আল্লাহর নবিকে ধ্বংস করতে গিয়ে নিজেই সদলবলে ধ্বংস হলো।

হযরত মূসা (আ)-এর তাওরাত লাভ

হযরত মূসা (আ) আল্লাহর নির্দেশে তাওরাত কিতাব আনার জন্য তুর পাহাড়ে গেলেন। সেখানে তিনি ইবাদতে নিমগ্ন ছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে সামেরী নামক এক ব্যক্তির ধোঁকায় পড়ে অনুসারীদের অনেকেই গো-বৎস পূজায় জড়িয়ে পড়ল। হযরত মূসা (আ) তাওরাত নিয়ে ফিরে এসে এ অবস্থা দেখে ভীষণ ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হলেন। আল্লাহর তরফ থেকে তওবা হিসেবে গো-বৎস পূজারিদের হত্যার নির্দেশ এল। এতে সত্তর হাজার বনি ইসরাইল নিহত হলো। হযরত মূসা (আ) ও হযরত হারুন (আ)-এর কান্নাকাটিতে অবশিষ্টদের ক্ষমা করা হলো। হযরত মূসা (আ) ১২০ বছর জীবিত ছিলেন।

হযরত হূদ (আ)

হযরত হূদ (আ) একজন নবি ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে 'আদ' জাতির হিদায়াতের জন্য পাঠিয়েছিলেন। 'আদ' সম্প্রদায় এবং হূদ (আ)–এর বংশতালিকা চতুর্থ পুরুষে 'সাম' **পর্যন্ত** পৌঁছে মিলে যায়। তাই হূদ (আ) তাদের বংশগত ভাই। আম্মান থেকে শুরু করে হাযরামাওত ও ইয়েমেন পর্যন্ত 'আদজাতির' বসতি ছিল। তারা যেমন ছিল শক্তিশালী তেমনি বিরাটাকায় সুঠামদেহের অধিকারী ছিল। তারা অহংকারী ও অত্যাচারী ছিল।

আদজাতি এক আল্লাহকে ভুলে গিয়ে মূর্তিপূজা ও নানারকম শিরকে লিপ্ত ছিল। হযরত হূদ (আ) তাদের শিরক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদত করতে বলেন। জুলুম-অত্যাচার ত্যাগ করে ন্যায়নীতি ও সুবিচার করতে বলেন। তারা অহংকার করে আল্লাহ ও রাসুলের আদেশ অমান্য করল। হযরত হূদ (আ) তাদের আজাবের ভয় দেখান, কিন্তু তারা ভয় পেল না। আল্লাহর ইচ্ছায় প্রথমে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ এলো। এতেও তারা শোধরাল না। পরে তাদের উপর লাগাতার ৭রাত ও ৮দিন ভীষণ ঘূর্ণিঝড় চলল। এতে তাদের ঘরবাড়ি, দালানকোঠা, গাছপালা ও লোকজন ধ্বংস হয়ে গেল। গোটা এলাকা মরুভূমিতে পরিণত হলো। অহংকার তাদের পতনের কারণ হলো। আজাবের সময় হযরত হূদ (আ) তাঁর অনুসারীদের নিয়ে একটি কুঁড়েঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁদের কিছুই হলো না। আল্লাহ তাঁদের নিরাপদে রাখলেন। পরে তাঁরা মক্কায় চলে যান।

হযরত সালিহ (আ)

হাজার হাজার বছর আগে এ পৃথিবীতে 'সামুদ' নামে একটি জাতি বাস করত। এরা ছিল নূহ (আ)–এর পুত্র 'সাম'–এর বংশধর। এ জাতি আরবের উত্তর-পশ্চিম এলাকায় বাস করত। এদের প্রধান শহর ছিল 'হিজর'। বর্তমানে এটি মাদায়েনে সালিহ নামে পরিচিত।

আমরা আগেই জেনেছি, এদের পূর্বে এখানে শক্তিশালী 'আদজাতি' বসবাস করত। তাদের হিদায়াতের জন্য তাদের কাছে হযরত হূদকে (আ) পাঠানো হয়েছিল। আল্লাহর অবাধ্যতার জন্য তাদের ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল।

সামুদজাতি 'আদজাতির' রেখে যাওয়া ধন–সম্পদ হস্তগত করল। তারাও অর্থে–বিত্তে, শক্তিতে, বুদ্ধিতে সমৃদ্ধির অধিকারী হলো। এই জাতিও সম্পদ ও শক্তির অহংকারে আল্লাহকে ভুলে গেল।

আল্লাহ তায়ালা তাদের হিদায়াতের জন্য তাদেরই বংশের লোক হযরত সালিহ (আ)-কে তাদের কাছে পাঠালেন। তিনি 'সামুদ' জাতিকে এক আল্লাহর উপর ইমান আনতে বললেন, তাঁর ইবাদত করতে বললেন। তারা আল্লাহর নবির কথা মানল না। তিনি তাদের আল্লাহর আজাবের সংবাদ দিলেন। তাতেও তারা ভয় পেল না। সালিহ (আ) তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে 'হিজর' ত্যাগ করলেন। সামুদ জাতির উপর আল্লাহর আজাব এল। ভীষণ শব্দ ও ভূমিকম্পে তারা ধ্বংস হয়ে গেল।

হযরত ইসহাক (আ)

হযরত ইসহাক (আ) ছিলেন প্রসিদ্ধ নবি হযরত ইবরাহীম (আ) এর দ্বিতীয় পুত্র। তিনি হযরত ইসমাঈল (আ)–এর ছোট ভাই। তাঁর মায়ের নাম হযরত সারা (আ)। বিখ্যাত নবি ইয়াকুব (আ) ছিলেন তাঁর পুত্র। তাঁর বংশে অনেক নবি–রাসুল জন্মগ্রহণ করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা হযরত লূত (আ)–এর নাফরমান সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার জন্য ফেরেশতাদের পাঠিয়ে ছিলেন। তাঁরা পথে ইবরাহীম (আ)-এর মেহমান হলেন। ইবরাহীম (আ) যথারীতি আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু মেহমানদের আহারের ব্যাপারে অনাগ্রহ দেখে বিস্মিত হলেন। মেহমানরা বললেন, "আমরা আল্লাহর ফেরেশতা। আমরা লূত (আ)-এর পাপী সম্প্রদায়কে ধ্বংসের জন্য যাচ্ছি।" তাঁরা এ সময় ইবরাহীম (আ) ও

তাঁর স্ত্রী সারা (আ)–কে তাঁদের পুত্র ইসহাক (আ)– এর জন্ম এবং নবি হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

ইসহাক (আ) তাঁর পিতা ইবরাহীম (আ) ও ভাই ইসমাঈল (আ) –এর দীন প্রচার করতেন। তিনি বেশিরভাগ সময় ছিলেন শামের ফিলিস্তিনে।

তিনি ৪০ বছর বয়সে বিয়ে করেন। ৬০ বছর বয়সে তাঁর জমজ দুই সন্তান ঈসু ও ইয়াকুব (আ) জন্মগ্রহণ করে। তিনি ১৮৬ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

হযরত লূত (আ)

হযরত লূত (আ) একজন নবি ছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)–এর ভাই হারানের পুত্র। ছোটবেলাতেই লূত (আ)–এর পিতা হারান মারা যান। তাই ইবরাহীম (আ) ভাইয়ের ইয়াতীম ছেলেকে নিজের পুত্রের মতোই লালনপালন করতেন এবং নিজের সঙ্গে রাখতেন। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত ইবরাহীম (আ)-এর সন্তান ছিল না। তিনি লূত (আ)-কে নিজের ওয়ারিস মনে করতেন। ইবরাহীম (আ)-এর উপর প্রথম ঈমান এনেছিলেন হযরত সারা (আ) ও হযরত লূত (আ)। তিনি ইবরাহীম (আ)-এর সাথে হিজরতও করেছিলেন।

হযরত ইবরাহীম (আ) যখন কিনআনে ছিলেন তখন তিনি লূত (আ)-কে সত্য দীন প্রচারের জন্য পূর্ব জর্দানের 'সাদুম' ও আমুরায় পাঠিয়েছিলেন। আরব, ফিলিস্তিন ও শামের মানচিত্রে দৃষ্টিপাত করলে বর্তমান পূর্ব জর্দান ও ফিলিস্তিনের মধ্যে একটি বিখ্যাত ও বিশাল জলাশয় দেখা যায়। তাকে বলা হয় মৃতসাগর। তাকে লূত সাগরও বলা হয়।

মৃতসাগর

সাদুম ছিল অত্যন্ত উর্বর ও সবুজ–সজীব এলাকা। সেখানেই তিনি বসতি নির্মাণ করেন। সেখানকার লোকেরা অতি বিলাসী জীবনযাপন করত। তারা পাপ, লজ্জাহীনতা ও নাফরমানির কাজগুলো গর্বের সাথে প্রকাশ্যে করে বেড়াত।

লূত (আ) তাদের হিদায়াতের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করলেন কিন্তু কোনো ফল হলো না। তারা লূত (আ) ও তাঁর অনুসারীদের এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিল। লূত (আ) তাদের বোঝালেন এবং আল্লাহর আজাবের কথা শোনালেন। কিন্তু তারা ঠাট্টা–বিদ্রূপ করতে

২০২৫

লাগল। লূত (আ) আল্লাহর আদেশে অনুসারীদের নিয়ে স্থান ত্যাগ করলেন। কিন্তু তাঁর কাফির স্ত্রী রয়ে গেল। আল্লাহ্ তায়ালা আজাবস্বরূপ বিকট শব্দ ও পাথরবৃষ্টি বর্ষণ করলেন এবং এলাকাটিকে উল্টিয়ে দিলেন। এতে মৃতসাগর সৃষ্টি হয়। সাদুমবাসীর আজাবের নিদর্শন এখনও বিদ্যমান।

হযরত শুয়াইব (আ)

হযরত শুয়াইব (আ) একজন বিখ্যাত নবি। তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)- এর তৃতীয় স্ত্রী কাতুরার পুত্র মাদয়ানের বংশধর। হযরত লূত (আ)-এর সাথেও তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। যে স্থানে তাঁরা বাস করতেন তাও মাদয়ান নামে অভিহিত। অতএব, মাদয়ান একটি জাতির ও একটি শহরের নাম। এটি ফিলিস্তিনের দক্ষিণ-পশ্চিম ও মায়নার পূর্বে মহাসড়কে অবস্থিত ছিল, যেখান থেকে শাম, আরব ও মিশরে বাণিজ্য কাফেলা যাতায়াত করত। এলাকাটি অত্যন্ত উর্বর ও সমৃদ্ধশালী ছিল। বাসিন্দারা অত্যন্ত ধনী ছিল। মাদয়ান শহরটি আজও পূর্ব-জর্দানের সামুদ্রিক বন্দর 'মায়ানের' অদূরে বিদ্যমান আছে।

হযরত মূসা (আ) মিশর থেকে মাদয়ানে এসেছিলেন এবং হযরত শুয়াইব (আ)-এর কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মূসা (আ) শুয়াইব (আ)-এর কন্যা সফুরাকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি শুয়াইব (আ)-এর আশ্রয়ে ১০ বছর ছিলেন। শুয়াইব (আ)-কে তাঁর চমৎকার বক্তৃতার জন্য খতিবুল আম্বিয়া বলা হয়।

হযরত শুয়াইব (আ)-কে যে সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানো হয়েছিল তাদেরকে আহলে মাদয়ান, আসহাবে মাদয়ান ও আসহাবে আইকা বলা হয়। এরা মূর্তিপূজা করত। নিজেরা নবির কথা মানত না। যারা মানত তাদের বাধা দিত ও নির্যাতন করত। পথিকদের ধনসম্পদ লুটে নিত। মাপে-ওজনে কম দিত।

মাদয়ানবাসীদের বিকট শব্দ, অগ্নিবৃষ্টি ও ভূমিকম্প দ্বারা ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

এরপর শুয়াইব (আ) হাযরামাওত যান এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেন।

হযরত ইলিয়াস (আ)

হযরত ইলিয়াস (আ) ছিলেন মূসা (আ)-এর ভাই হারুন (আ)-এর বংশধর। তিনি জর্দানের 'আলআদ' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তখনকার ইসরাইলের শাসনকর্তা ছিলেন আখিব অথবা আখিয়াব। তিনি হযরত হিযকীল (আ)-এর পরে এবং আল ইয়াসা (আ)-এর পূর্বে বনি ইসরাইলের হিদায়াতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি হযরত হিযকীল (আ)-এর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি শামের বাসিন্দাদের হিদায়াতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রচারের কেন্দ্র ছিল শামের শহর 'বালাবাক্‌'।

ঐ সময় ইসরাইলিরা আল্লাহকে ভুলে যায়। তারা এক আল্লাহর ইবাদত না করে নানারকম শিরকে লিপ্ত হয়। তারা মূর্তি ও তারকাপূজা করত । তাদের প্রধান মূর্তি ছিল বা'ল দেবতা। নবির কথায় বাদশাহ ইমান এনেছিল। কিন্তু তার স্ত্রীর প্ররোচনায় আবার শিরকে লিপ্ত হয়।

আল্লাহর আজাবে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল । ৩ বছর ধরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ চলছিল । ঐ সম্প্রদায়ের লোকেরা নবির কাছে এসে আবেদন–নিবেদন করায় তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। কিন্তু বিপদ কেটে যাওয়ার পর আবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে মুশরিক হয়ে যায়। তাদের উপর আজাবের জন্য তারা নবিকেই দোষারোপ করে। তারা তাঁর প্রতি ঘোরতর শত্রুতা শুরু করে। তিনি তাঁর অনুসারীদের নিয়ে স্থান ত্যাগ করেন। তাদের উপর আবার আল্লাহর আজাব আসে।

হযরত যুলকিফল (আ)

হযরত যুলকিফল (আ) ছিলেন আল্লাহ্ তায়ালার একজন প্রিয় বান্দা। যুলকিফল অর্থ প্রতিজ্ঞা রক্ষাকারী। দায়িত্ব পালনকারী। তিনি হযরত আইয়ুব (আ)-এর পুত্র ছিলেন বলে উল্লেখ আছে। নবি হযরত ইয়াসা (আ) খুব বৃদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি তাঁর একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে চাইলেন, যিনি তাঁর পক্ষ থেকে নবির কর্তব্য পালন করতে পারেন। নবি তার অনুসারীদের একত্রিত করে বললেন, যার মধ্যে তিনটি শর্ত বিদ্যমান থাকবে তাঁকেই আমি প্রতিনিধি নিযুক্ত করব। শর্ত তিনটি হলো:

১. সর্বদা দিনে রোযা রাখা

২. সারারাত ইবাদত করা

৩. কোনো সময় রাগ না করা

এক ব্যক্তি উঠে বললেন, এ তিনটি গুণ আমার মধ্যে আছে। নবি প্রথম দিনের সমাবেশ শেষ করলেন। পরবর্তী দিনে আবার সমাবেশ হলো। নবি পূর্ববর্তী শর্ত আবার উল্লেখ করলেন। এবারও ঐ ব্যক্তি উঠে আগের মতো বললেন। নবি তাকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করলেন। হযরত যুলকিফল সারাজীবন শর্ত পূরণ করে চললেন।

ইবলিস শয়তান তাঁকে পথভ্রষ্ট করার জন্য এক মযলুম বৃদ্ধের বেশে পর পর তিনদিন তাঁর ধৈর্যচ্যুতির চেষ্টা করল। তাঁকে রাগাতে চাইল। কিন্তু পারল না। তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে পরবর্তীতে নবি করেছিলেন।

হযরত যাকারিয়া (আ)

হজরত যাকারিয়া (আ) ছিলেন বনি ইসরাইলের একজন নবি। তিনি ছিলেন হজরত সুলাইমান (আ)-এর বংশধর। তাঁর স্ত্রী ছিলেন হযরত হারুন (আ)-এর বংশধর।

হযরত ঈসা (আ)-এর মাতা মরিয়মের অভিভাবক ছিলেন হযরত যাকারিয়া (আ)। তিনি ইবাদতখানার ইমাম ও মোতোয়াল্লী ছিলেন। তাঁর বংশে হযরত ইমরান ও তাঁর স্ত্রী হান্না ছিলেন আল্লাহভক্ত। হান্না ছিলেন মরিয়মের মাতা।

হযরত যাকারিয়ার কোনো সন্তান ছিল না। বৃদ্ধ অবস্থায় সন্তানের আশাও ছিল না। মরিয়মের কাছে অমৌসুমি ফল দেখে তাঁর মনে আশার সঞ্চার হয়। তিনি আল্লাহর কাছে সন্তান কামনা করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিলেন যার নাম হবে ইয়াইহিয়া।

তাঁর সম্প্রদায় তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল না। ইমান আনল না। তারা নবির সাথে শত্রুতা শুরু করল। তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করতে লাগল। তিনি একটি গাছের কোটরে আশ্রয় নিলেন। ইহুদিরা তাকে গাছসহ দ্বিখণ্ডিত করল। তিনি উহ্ শব্দটিও করলেন না। সবুর করলেন। আমরা তাঁর জীবন থেকে ধৈর্যের শিক্ষা গ্রহণ করব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা দশজন নবি-রাসুলের নাম খাতায় লিখবে।

অনুশীলনী

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১) মহানবি (স)-এর মায়ের নাম কী?

ক. মরিয়ম খ. আমিনা

গ. আছিয়া ঘ. ফাতিমা

২) হিলফুল ফুজুল কত বছর স্থায়ী ছিল?

ক. ২০ বছর খ. ৩০ বছর

গ. ৪০ বছর ঘ. ৫০ বছর

৩) মহানবি (স) কতো বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন?

ক. ৪০ বছর খ. ৪৫ বছর

গ. ৫০ বছর ঘ. ৫৩ বছর

৪) হযরত মূসা (আ)-এর পিতার নাম কী?

ক. ইউসুফ খ. ইমরান

গ. ইদরীস ঘ. ইউনুস

৫) মিশর ছেড়ে হযরত মূসা (আ) কোথায় গিয়েছিলেন?

ক. ইরাকে খ. ইরানে

গ. সিরিয়া ঘ. মাদায়ানে

৬) হযরত হূদকে (আ) কোন জাতির কাছে পাঠানো হয়েছিল?

ক. আদ খ. সামুদ

গ. কুরাইশ ঘ. কিবতী

৭) হযরত ইসহাক (আ)–এর পিতার নাম কী?

ক. হযরত নূহ (আ) খ. হযরত ইদরীস (আ)

গ. হযরত ইবরাহীম (আ) ঘ. হযরত সুলায়মান (আ)

৮) হযরত যাকারিয়া (আ)–এর পুত্রের নাম কী?

ক. হারুন খ. ইউসূফ

গ. ইয়াহিয়া ঘ. ইমরান।

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. কুরআন মজিদে .... জন নবি–রাসুলের নাম উল্লেখ আছে?

২. মহানবি (স)-এর .... নাম আবু তালিব।

৩. মহানবি (স)-এর .... উপর অটল বিশ্বাস ছিল।

৪. হিলফুল ফুজুল শব্দের অর্থ .... সংঘ।

৫. প্রথম তিন বছর .... জন নর–নারী ইসলাম গ্রহণ করেন।

গ. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
ক. মহানবি (স) এর আম্মা আমিনা ইন্তিকাল করেন মহানবি (স) এর	১৫ বছর বয়সে ৬৩ বছর বয়সে
খ. মহানবি (স) হিলফুল ফুজুল গঠন করেন	৬ বছর বয়সে
গ. মুহাম্মদ (স) নবুয়ত লাভ করেন	৪০ বছর বয়সে

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. মহানবি (স) কত খ্রিস্টাব্দে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

২. মুহাম্মদ শব্দের অর্থ কী?

৩. পৃথিবীর সর্বপ্রথম নবির নাম লেখ।

৪. হিলফুল ফুজুল কী?

৫. মহানবি (স) চাকরদের সম্পর্কে কী বলেছেন?

৬. প্রাচীনকালে মিশরের বাদশাহকে কী বলা হতো?

৭. মুসা (আ) কার ঘরে এবং অর্থব্যয়ে লালিত পালিত হয়েছিলেন?

৮. নারীদের মধ্যে এবং পুরুষদের মধ্যে কে কে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. মুহাম্মদ (স)-এর চরিত্রের ৫টি সুন্দর আদর্শ লেখ। সামাজিক জীবনে উক্ত আদর্শগুলোর গুরুত্ব কী?

২. শিশু মুহাম্মদ (স) কীভাবে অন্যের অধিকার সংরক্ষণ করেছেন? বর্ণনা কর।

৩. মহানবি (স) নিজ হাতে কী কী কাজ করতেন? নিজ নিজ পরিবারে নিজ হাতে করতে পারা যায় এমন ৫টি কাজের তালিকা তৈরি কর।

৪. মহানবি (স) চাকর ও শ্রমিকদের সম্পর্কে কী বলেছেন তার বর্ণনা দাও।

৫. ফিরআউন কীভাবে মারা যায় তার বর্ণনা দাও।

৬. আদজাতি কোথায় বসবাস করত? তাদের ধ্বংসের কারণ লেখ।

৭. লূত বা মৃত সাগর কোথায়? বর্ণনা কর।

হামদে ইলাহী

কাজী নজরুল ইসলাম

শোন শোন ইয়া ইলাহী
আমার মোনাজাত।
তোমারি নাম জপে যেন
হৃদয় দিবস রাত।

যেন কানে শুনি সদা
তোমারি কালাম হে খোদা,
চোখে যেন দেখি শুধু
কুরআনের আয়াত।

দুখে যেন জপি আমি
কলমা তোমার দিবস–যামী,
(তোমার) মসজিদেরই ঝাড়ু বর্দার
হোক আমার এ হাত।

সুখে তুমি দুখে তুমি,
চোখে তুমি বুকে তুমি,
এই পিয়াসী প্রাণের, খোদা
তুমি আব হায়াত।

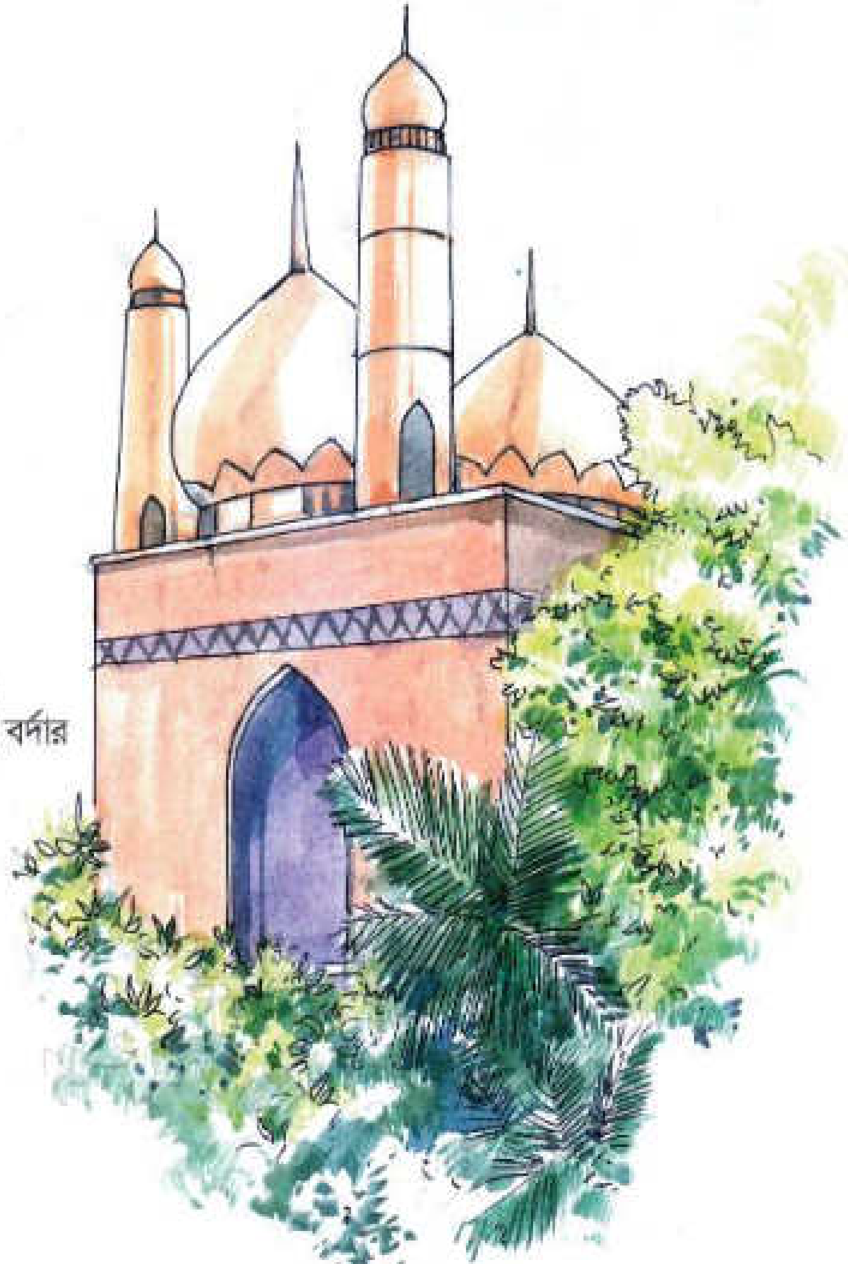

নাতে রাসুল (স)

ফররুখ আহমদ

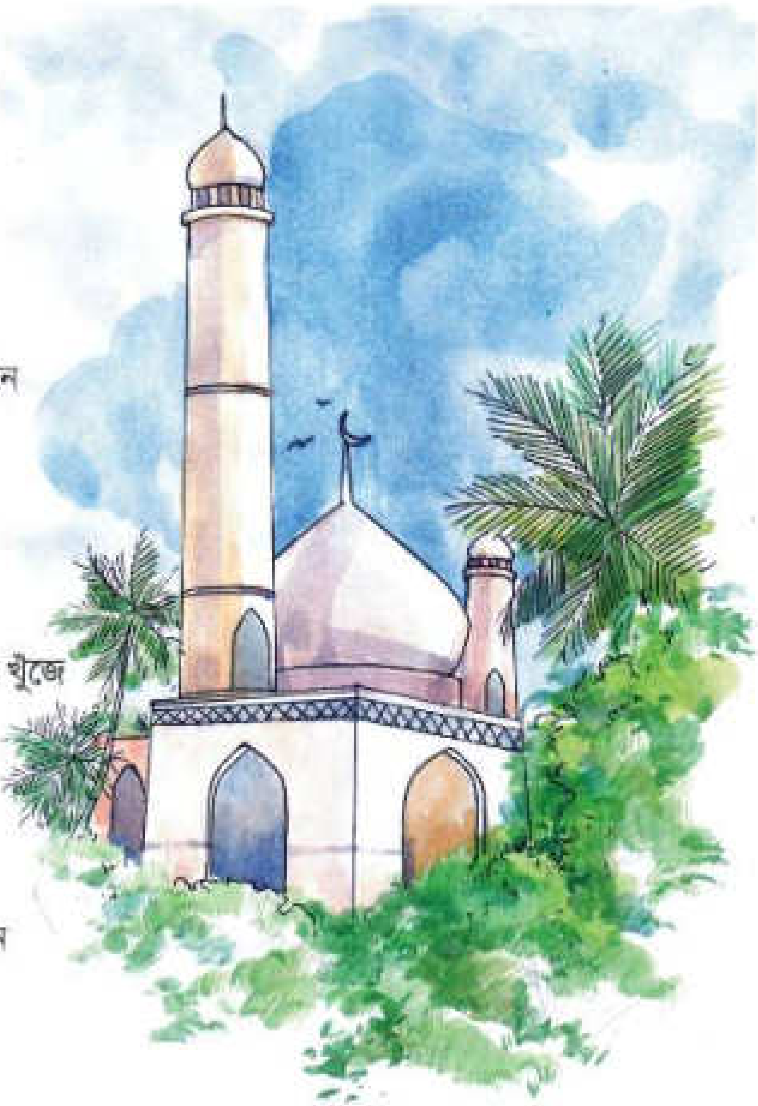

ওগো– নূর নবী হযরত
আমরা– তোমারি উম্মত।
তুমি দয়াল নবী,
তুমি নূরের রবি,

তুমি– বাসলে ভালো জগত জনে
দেখিয়ে দিলে পথ।

আমরা– তোমার পথে চলি
আমরা– তোমার কথা বলি
তোমার আলোয় পাই যে খুঁজে
ঈমান ইজ্জত।
সারা জাহানবাসী
আমরা– তোমায় ভালোবাসি,
তোমায় ভালোবেসে মনে
পাই মোরা হিম্মত।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা হামদে ইলাহী ও নাতে রাসুল সুর করে শ্রেণিতে পরিবেশন করবে।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য, চতুর্থ শ্রেণি–ইসলাম

তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করো।

–আল কুরআন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য